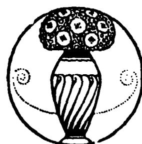
সোনার খনির সন্ধানে

তাপসী, ছোটদের গল্প ও

ছেলেদের গল্পের

লেখক

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত



প্রকাশক—

শ্রীশান্তিবিন্দু গুপ্ত, বি-এস্-সি

পৌষ, ১৩৪০

প্রকাশক
শ্রীশান্তিবিন্দু গুপ্ত, বি-এস্‌-সি
২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ইউ, রায়, এণ্ড সন্স
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
হইতে শ্রীসুধীরচন্দ্র কায়েত
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

'সোনার খনির সন্ধানে' গল্পটি 'মুকুলে' ছাপা হইয়াছিল। ছেলে ও মেয়েদের উহা পড়িতে আগ্রহ দেখা গিয়াছে। গল্পটিকে ছোটদের উপন্যাস বলা যাইতে পারে।

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৩
২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা



শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

১। তাপসী — ষোলটি বরণীয়া নারীর অপূর্ব্ব জীবনচরিত ১।৵০ আনা।

২। পুণ্যবতী নারী — তিনটি ধর্ম্মশীলা নারীর জীবন-চরিত ৸০ আনা।

৩। ছোটদের গল্প — "সন্দেশে"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শিল্পী ও সুলেখক পরলোকগত সুকুমার রায় লিখিয়াছিলেন, "ছোট শিশুদের নিকট তাহাদের উপযোগী ভাষায় গল্প বলিতে লেখক বহুকাল হইতে অভ্যস্ত। সুতরাং তাঁহার রচিত এই গদ্য ও পদ্য গল্পগুলি শিশুমহলে সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। * * বাংলা সাহিত্যে এই প্রকার গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে।" ১৵০ আনা।

৪। ছোটদের বই — "সঞ্জীবনী"র সম্পাদক বলেন — "গল্পগুলির আখ্যানবস্তু হৃদয়দ্রবকারী, ভাষা প্রাণস্পর্শী, * * আমাদের সম্মুখে ৮ বৎসরের একটি বালিকা "অশ্রু ও অরুণ" পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল।" ॥০ আনা।

৫। ছেলেদের গল্প — চতুর্থ সংস্করণ, ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, এবং কমলা বুক ডিপো, ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস প্রভৃতি কলিকাতার পুস্তকালয় ও ঢাকা স্কুল সাপ্লাই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।



সুরেশ

—১ পৃষ্ঠা

সোনার খনির সন্ধানে

প্রথম পরিচ্ছেদ

করুণাময় মুখোপাধ্যায় এম-ডি পাশ-করা ডাক্তার। তাঁহার জন্মস্থান রাউলপিণ্ডি, কর্ম্মস্থান ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড় আসামের একটি বড় সহর। সেখানে তিনি সিবিলসার্জ্জন। তাঁহার ডাক্তারির চেয়ে খনি আবিষ্কারের দিকেই মনের একটা ঝোঁক ছিল। আসামের কোন্ জঙ্গলে কেরোসিন তেলের খনি, কোন্ পাহাড়ে কয়লার খনি, সুবিধা পাইলেই তিনি তাহার খোঁজ করিতে বাহির হইতেন।

একবার যথার্থই তিনি এক বনের মধ্যে কেরোসিন তেলের খনি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। ঐ খনি হইতে কেরোসিন তেল, মোম এবং চমৎকার রং বাহির হইতে লাগিল। তাহার পরেই ডাক্তার মহাশয়ের মাথায় মস্ত বড় এক খেয়াল চাপিয়া বসিল। যে রকমেই হউক, সোনার খনি তাঁহাকে আবিষ্কার করিতেই হইবে। এজন্য তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীর উজানে অনেক দূরে চলিলেন। সেইখানে সুবৃহৎ পাহাড়ের একটি ঝরণার জল পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মন নাচিয়া উঠিল; তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, সেই পাহাড়েই কোন একটি জায়গায় সোনার খনি আছে।

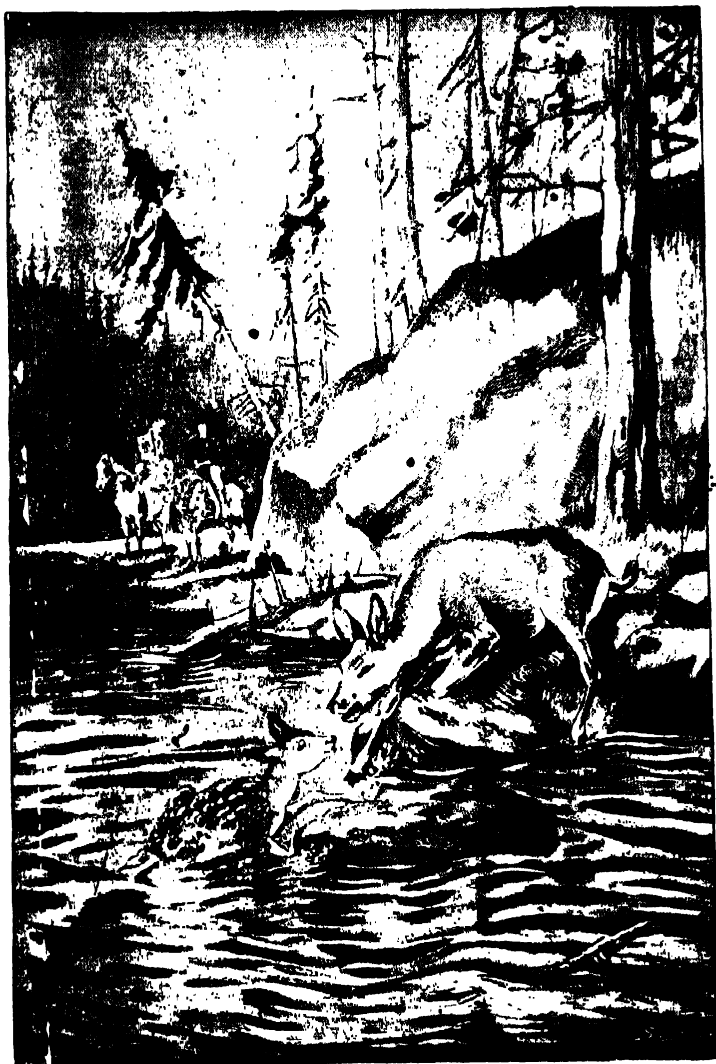
তাহার পরে আশ্বিন মাস আসিল, পূজার সময় আপীস আদালত বন্ধ হইল। সেই সুযোগে করুণাময় বাবু এক মাসের ছুটি লইলেন

খনি আবিষ্কার করিতে যাওয়ার যখন সকল বন্দোবস্তই এক রকম ঠিক্ হইল, তখন ডাক্তার মহাশয়ের আট বৎসর বয়সের ছেলে সুরেশ আব্দার করিয়া বলিল—"বাবা, সোনার খনি আমাকে দেখ্‌তেই হবে। অনেক খানি জায়গা জুড়ে শুধুই সোনা! চারদিকে ঝক্ ঝক্ কর্‌ছে কেবলই সোনা! সে যে দেখ্‌তে কি মজা! তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতেই হবে।"

সুরেশের মা মনোরমা দেবী হাসিয়া বলিলেন—"এবার আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

খুব জাঁকজমকের সহিতই যাত্রার আয়োজন হইল। করুণাময় বাবু বেশ বড় দেখিয়া একখানা বোট ভাড়া করিয়া, পরিবারের সবাইকে লইয়াই উহাতে আরোহণ করিলেন। মাঝিরা ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোতের উল্টা দিকে বোট ভাসাইয়া প্রকাণ্ড পাল তুলিয়া দিল। বোটের সঙ্গে নানা রকম খাবার জিনিস, কয়েকজন গুর্খা সৈন্য এবং বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলি লইয়া একখানি ছোট নৌকাও চলিল।

দিনের পরে দিন যতই বোটখানা সাম্‌নের দিকে চলিতে লাগিল, ততই নানা রকম দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বড় খুসী হইতে লাগিলেন। দূরে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিত, দুই তীরের পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় অসংখ্য তরুলতা ও কালো কালো পাথর শোভা পাইত; কত ঝরণা ঝর ঝর শব্দ করিয়া উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে ছুটিয়া যাইত। নানা রকমের পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিত আবার আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় চলিয়া যাইত। ছোট ছোট হরিণগুলি নাচিতে নাচিতে নদীর তীরে আসিত, আবার মানুষ দেখিয়া বনের ভিতর লুকাইয়া পড়িত। একদিন একটা বড় হরিণ তাহার বাচ্চা লইয়া ঝরণার জল খাইতেছিল; তখন একজন গুর্খা গুলি করিয়া হরিণটাকে মারিয়া ফেলিল এবং ছোট বাচ্চাটিকে ধরিয়া



একটা বড় হরিণ ও তাহার বাচ্চা

-২ পৃষ্ঠা

বোটের ভিতরে লইয়া আসিল। সুরেশ ও তাহার একটি বোন বাচ্চাটিকে পাইয়া যে কি করিবে তাহাকে কি খাওয়াইবে সেইজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আর একদিন করুণাময় বাবু নদীর তীরে বোট লাগাইয়া, সঙ্গের গুর্খা সৈন্য কয়েক জনকে লইয়া পাহাড়ে শিকার করিতে গেলেন; ছোট বড় সারি সারি অসংখ্য বৃক্ষের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিতেই সাম্‌নে বনগরুর পাল! সে কি ভীষণ দৃশ্য! সাহসী করুণাময় বাবুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। কেনই বা কাঁপিয়া উঠিবে না? আসামের জঙ্গলে যত রকম জানোয়ার আছে, তাহার মধ্যে এই বনগরুই বড় ভয়ঙ্কর! গরুগুলি আকৃতিতেও ভীষণ, প্রকৃতিতেও ভীষণ! একবার ক্ষেপিয়া গেলে মরণ বাঁচন তাহারা বোঝে না, হয় ত শিকারীকে মারিবে, নয় ত নিজেরা মরিবে।

এই বনগরুর পাল দেখিয়াই করুণাময় বাবু গুর্খাদের সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করিতে লাগিলেন. এক সঙ্গে অনেকগুলি বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া গরুর পাল ছুটিয়া চলিল; কিন্তু একটি ছোট বাছুর পিছনে পড়িয়া রহিল। গুর্খাদের এমন কুবুদ্ধি, তাহারা সেই বাছুরটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। যেমনই বাছুরকে বাঁধা, অমনি দূর হইতে তাহার মা সেই দৃশ্য দেখিতে পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। অবশেষে শিং নাচাইতে নাচাইতে বাছুরের কাছে ছুটিয়া আসিল। গুর্খারা চারি পাঁচ গুলিতে তাহাকে মারিয়া ফেলিল। দূর হইতে বনগরুর পাল যখন এই দৃশ্য দেখিতে পাইল, তখন আর গুর্খারা যায় কোথায়? সমস্ত গরুর পাল ক্ষেপিয়া গেল এবং ছুটিয়া আসিল। করুণাময় বাবু ভয়ে ভয়ে গুর্খাদের লইয়া প্রকাণ্ড এক গাছের উপরে উঠিলেন। গরুর পাল শিং দিয়া গুঁতাইয়া গাছটাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। তাহাদের এমনই রাগ, যদি কোন রকমে লাফাইয়া উঁচুতে উঠিয়া,

করুণাময় বাবুদের কাছে যাইতে পারিত, তবে কি আর রক্ষা থাকিত? গুর্খারা গাছের উপর হইতে গুলি করিয়া যখন চার পাঁচটা গরুকে মারিয়া ফেলিল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া দলবল সহ চলিয়া গেল।

করুণাময় বাবু বনগরুর বাছুরটিকে লইয়া বোটে ফিরিয়া আসিলেন। ছেলে মেয়েরা সুন্দর বাছুরটিকে পাইয়া খুব খুসী হইল। কিন্তু বাছুরটি কিছুই খাইল না, সে বোট হইতে বনে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ দিকে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। পাহাড়ের উপরে অসভ্য জাতির বাস। তাহারা স্বাধীন। তাহাদের রাজাও অসভ্য। রাজা হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। তাহার পরে সঙ্গে একদল অসভ্য লইয়া করুণাময় বাবুর বোটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। রাজার মাথায় পাখীর পালকের টুপি, পরণে বেতের তৈরী এক রকম আচ্ছাদন। কাঁধে প্রকাণ্ড কুড়াল ও ধনুক, হাতে মস্তবড় বর্শা। সঙ্গের অসভ্যদের পরণেও বেতের তৈরী নেংটি, হাতে ধনুক ও বর্শা। রাজা করুণাময় বাবুকে কহিল, "এই পাহাড়ে আমার অনুমতি ছাড়া কেহ বন্দুক ছুঁড়িতে পারে না। বিনা অনুমতিতে বনগরু মারাও নিষেধ। তোমরা বন্দুক ছুঁড়ে ও বনগরু মেরে বড় অন্যায় কাজ করেছ। তাই নগদ একশত টাকা, আর তোমাদের বন্দুক, বারুদ, গুলি সবই আমাকে দিতে হবে। নইলে তোমাদের বন্দী করে নিয়ে যাব।"

করুণাময় বাবু কহিলেন—"আপনাকে দশ টাকা নজর, আর আপনার সঙ্গের এক এক জনকে এক এক টাকা করে দেব। কিন্তু বন্দুক, বারুদ ও গুলি দিতে পার্‌ব না। দেব কেমন করে? এই গুর্খারা ইংরাজের সৈন্য। বন্দুক বারুদ সবই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের। এ সব জোর করে কেড়ে নিয়ে আমাদের বন্দী কর্‌লে, আপনাকে বিপদে পড়্‌তে হবে। ইংরাজ হয়ত



অসভ্যদের রাজা

পৃষ্ঠা।

এই অপরাধের জন্য কামান পেতে আপনার ক্ষুদ্র রাজ্যের বাড়ী-ঘর সমস্ত তোপে উড়িয়ে দেবেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজার মেজাজ ঠাণ্ডা হইল। তিনি নিজে দশ টাকা আর সঙ্গের অসভ্যদের পঁচিশ জনের জন্য ২৫৲ পঁচিশ টাকা পাইয়াই বিদায় হইলেন। করুণাময় বাবু সেই মুহূর্ত্তেই নৌকায় পাল তুলিয়া দিতে মাঝিদের আদেশ করিলেন। পালের নৌকা ছুটিয়া চলিল।

কয়েকদিন পরে প্রকৃত বিপদ ঘনাইয়া আসিল। বোট ও তাহার সঙ্গের নৌকা যতই নদীর উজানে যাইতেছিল, ততই ব্রহ্মপুত্র ছোট হইয়া আসিতেছিল। তাহার পরে বোট ও নৌকা এমন একটি জায়গায় গিয়া পৌঁছিল, সেখানে ব্রহ্মপুত্র যেন একটা হ্রদের মতন। অনেক দূর ব্যাপিয়া গভীর জল; সেই জলে ভয়ানক স্রোত। অথচ সেইখানেই সন্ধ্যা হইল। আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিল। করুণাময় বাবু ভয় পাইয়া মাঝিকে বলিলেন—"মাঝি, মেঘটা যে বড় ভয়ানক। হয় ত এখনি ঝড় হবে। বোটখানা কোন ভাল জায়গায় বাঁধা যায় কি না, একবার চেষ্টা করে দেখ ত।"

আর ভাল জায়গা! পনের মিনিট যাইতে না যাইতেই আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া ঝড় আসিল। নদীর এক একটা ঢেউ বোট ও তাহার সঙ্গের নৌকাটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জলে ডুবাইয়া দিবার জন্য লম্ফ-ঝম্ফ করিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বোট ও নৌকা ব্রহ্মপুত্রের অতল জলে ডুবিয়া গেল।

তিন ঘণ্টা পরে ঝড় আর রহিল না। তাহার পরে মেঘ কাটিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল। রাত্রে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ঝলমল করিতে লাগিল। এই সময়ে এক সন্ন্যাসী ব্রহ্মপুত্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি, দীর্ঘ কেশ, গৈরিক বেশ। সন্ন্যাসী দেখিলেন, নদীর তীরের বালির উপরে রাজার ছেলের মতন অতিশয় সুন্দর একটি বালক। বালকটি মৃতবৎ পড়িয়া আছে। দেখিয়া মনে হইতেছে,

কোন্ এক অসুর স্বর্গের দেবশিশুকে মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। ছেলেটিকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তিনি শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ছেলেটি এখনও বাঁচিয়া আছে। তাই সন্ন্যাসী ছেলেটিকে কাঁধে লইয়া আপনার মঠে চলিলেন। পাহাড়ের একটি উচ্চ শৃঙ্গের উপরে তাঁহার মঠ। মঠে থাকিয়াই তিনি ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তপস্যা করেন। সন্ন্যাসী নানা রকম চেষ্টা করায় ছেলেটির জ্ঞান জন্মিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিল।

তাহার পরে ছেলেটি যখন একটু সুস্থ হইল, আপনার অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল, তখন সে তার বাপ মা ও বোনদের জন্য এমন কাঁদিতে লাগিল, সেই কান্না শুনিলে পাষাণও বা বুঝি গলিয়া যায়। এই ছেলেটি আর ত কেহ নয়—এ যে করুণাময় বাবুর ছেলে সুরেশ। সন্ন্যাসী তাহার কাছে নৌকা-ডুবি এবং তাহার বাপ মায়ের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ছুটিয়া গেলেন। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায়ই বা সুরেশের পিতা, কোথায়ই বা তাহার মাতা? কাহারও ত কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁহারা যে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্ন্যাসীর কোনই সন্দেহ রহিল না। তিনি মঠে ফিরিয়া আসিয়া সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিব্রুগড়ের বাড়ীতে তোমাদের আর কে আছে?"

সুরেশ। দারোয়ান ও চাকর ছাড়া আর ত কেউ নেই।

সন্ন্যাসী। তোমাদের রাউলপিণ্ডির বাড়ীতে কে আছেন, তা তুমি বল্‌তে পার?

সুরেশ। সেখানেও ত কেউ নেই।

সন্ন্যাসী। তোমাদের আত্মীয় কি আপনার লোক কেউ আছেন?

সুরেশ এই কথার কোনই জবাব দিতে পারিল না। সে ত শৈশবকাল হইতে আসামেই বাস করে, আত্মীয় স্বজনের কোন কথাই সে জানে না।

কে বলিবে ঈশ্বরের কি ইচ্ছা ? সন্ন্যাসী যখন সুরেশের সব কথা শুনিলেন, তখন তাহার হৃদয়ে করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনটা সুরেশের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। তিনি মমতায় পূর্ণ হইয়া ছেলেটিকে আপনারই স্নেহবক্ষে তুলিয়া লইলেন। সুরেশকে সান্ত্বনা দেওয়া ও সুখী করা ছাড়া তাঁহার যেন আর কোন কাজই রহিল না।

সন্ন্যাসী এখন যে মঠে আছেন, সেটি তাঁহার অল্পদিন বাস করার একটা আড্ডা মাত্র। তাঁহার আসল থাকিবার জায়গা হিমালয় পর্ব্বতের একটি উচ্চ শৃঙ্গে। সেখানে বিস্তর পাহাড়ী লোক বাস করে। সন্ন্যাসী পাহাড়ীদের গুরু এবং চালক বলিলেও হয়। সে পাহাড়ের রাজা ও রাণী হইতে সামান্য অবস্থার পুরুষ ও মেয়েরাও তাঁহাকে দেবতার মত মান্য করে। সন্ন্যাসী পাহাড়ীদের শিক্ষা দিয়া, নানা রকম রীতিনীতি শিখাইয়া অনেকটা সভ্য করিয়া তুলিয়াছেন। সন্ন্যাসী এখন সুরেশকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ের দিকে রওনা হইলেন। সেখানকার লোকেরা সুরেশকে দেখিয়া খুসী হইল। স্বয়ং রাজা ও রাণী তাহাকে গুরুর ছেলে মনে করিয়া সোনা, রূপা ও আরো তাদের দেশের অনেক ভাল ভাল দ্রব্যসামগ্রী উপহার দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কে বলিবে সুরেশের মুখে কি মায়া মাখা ছিল, সন্ন্যাসী ত তাহাকে দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি এক এক সময় সুরেশের পানে চাহিয়া মনে মনে বলেন, "তুমি কোন্ দেবতার দেশ হতে আমার কাছে এসেছ? তোমার মুখের পানে চেয়ে আমি যে আমার ঈশ্বরকেই দেখ্‌তে পাই!"

সুরেশ এই ত সবে কয়েক বৎসর সন্ন্যাসীর কাছে আছে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই সন্ন্যাসী তাহার মধুর প্রকৃতিতে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। একদিন এই ছেলেটিকে না দেখিলে তাঁহার যেন আর চলে না। পাহাড়ের যে সকল রাজা সন্ন্যাসীর শিষ্য, তাঁহারা সন্ন্যাসীর কাছে সোনা, রূপা ও টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলে, আগে তিনি বলিতেন, "এ সব নিয়ে আমি কি কর্‌ব? আমার কোন্ কাজে লাগ্‌বে?"

রাজারা বলিতেন, "কাজে না লাগ্‌লে এ সব বরং দানধ্যান করুন, তাতে গরীবদেরও উপকার হবে, আপনিও খুব খুসী হবেন।"

কিন্তু এখন ঐ সকল রাজারা সন্ন্যাসীকে সোনারূপা ও টাকা দিতে আসিলে হাসিমুখেই তিনি তাহা গ্রহণ করেন এবং সেই সকল সোনারূপায় সুরেশকেই সাজাইতে চাহেন। সুরেশের মাথায় মেয়েদের মতন লম্বা লম্বা চুল, পরণে স্বর্ণখচিত বস্ত্র, গায়ে আলখেল্লার মতন স্বর্ণখচিত জামা, কাণে সোনার কুণ্ডল, গলায় সোনার হার। সে যেন ঠিক্ একটি রাজার ছেলে। সন্ন্যাসী তাহাকে রাজার ছেলের মতনই সুখে মানুষ করিয়া তুলিতেছেন।

কিন্তু হায়, সুরেশের এ সুখও অতি অল্প দিনের জন্য। কেন অল্প দিনের জন্য, সেই কথাই এখন বলিতেছি। এলাহাবাদে কুম্ভমেলা। এই মেলায়, যত রাজ্যের সন্ন্যাসী, সকলে আসিয়া মিলিত হন। আমাদের পাহাড়ের সন্ন্যাসীও সুরেশকে সঙ্গে লইয়া কুম্ভমেলায় উপস্থিত হইলেন।

সেখানে যেমন হাজার হাজার সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তেমনি কত দেশের কত রাজা, কত বড় লোক, কত সাধারণ লোক মেলা দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত মেলার মধ্যে সুরেশই যেন দেখিবার একটি অপূর্ব্ব বস্তু। সকলেই অবাক্ হইয়া তাহার সুন্দর মুখশ্রী, বিচিত্র পোষাক এবং অঙ্গের অলঙ্কার দেখিত। মেলায় যে সবই ভাল লোক আসিয়াছিল, তাহা নহে। এক দল বোম্বেটে দিব্বি সন্ন্যাসী সাজিয়া, গায়ে ভস্ম মাখিয়া, বাঘের চামড়া পরিয়া মেলায় আসিয়াছিল ; চুরি ডাকাতি করাই তাহাদের মতলব। তাহারা সুরেশকে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল,—

প্রথম বোম্বেটে। দেখেছিস্, ছেলেটির গায়ে সোনার গহনা ?

দ্বিতীয়। দেখ্‌লে কি হবে ? ওকে যে একলা পাওয়া যায় না। ও যে সন্ন্যাসীর হাত ধরেই ঘুরে বেড়ায়।

তৃতীয়। একলা পেলেই ওকে কিছু খাবারটাবার দিয়ে ওর সঙ্গে ভাব করা যায়। একবার ভাব করতে পার্‌লে ফাঁদে ফেল্‌তে আর কতক্ষণ ?

চতুর্থ। ফাঁদে ফেলে আমাদের নৌকায় নিয়ে যেতে পার্‌লেই ফাঁদের পাখীর মতনই ওর গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারি ! মেরে ফেল্‌তে পার্‌লেই গায়ের সোনারূপা একটি একটি করে খসিয়ে নেওয়া যায়।

পঞ্চম। ভায়া, এবার মেলায় পুলিস্ যে রকম পাহারা দিচ্ছে, ধরা পড়্‌লেই একেবারে ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌তে হবে।

প্রথম। হাঁ, ধরা পড়্‌ব না ত আরো কিছু ! সেবার মেলায় তুই ছিলি কোথায় ? পুলিস ত পুলিস ! কত বেটা সিপাহির চোখে ধুলা দিয়ে এই হাতে আট দশটা মানুষের মাথা ভেঙ্গে, কত টাকা সিন্ধুকে পুরেছি।

পঞ্চম। তুমি কত টাকা সিন্ধুকে পূরেছিলে বটে, কিন্তু তোমার খুড়ার কি হয়েছিল, সে কথা বুঝি মনে নেই ? বেচারা একটি মেয়েলোকের টাকা কেড়ে নিতেই সে তার পরণের অর্দ্ধেকখানি কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস লাগালো। ফাঁস লাগিয়েই 'পুলিস পুলিস' বলে চীৎকার। খুড়া

তখন আর যায় কোথায়? রাঙা পাগ্‌ড়ি-পরা সিপাহির দল এসে খুড়াকে বেঁধে ফেল্লে। তার পরে তার নৌকায় যে সব লোক ছিল, তাদেরও গ্রেপ্তার কর্‌লে। শুধু কি তাই? খুড়া আট দশ বছর বোম্বেটেগিরি করে যে কিছু টাকা জমিয়েছিল, তা নৌকার ভিতরেই একটি কাঠের সিন্ধুকে রেখেছিল; সিপাহিরা সেই টাকার সন্ধান পেয়ে, দিব্বি করে লুটে পুটে নিয়ে তাদের মেয়ের গয়না গড়ালো।

তাহার পরে কুম্ভমেলায় কলেরা হইতে লাগিল। কলেরা-অসুর আমাদের পাহাড়ের সন্ন্যাসীকেই যেন চাপিয়া ধরিল। দুই দিনের অসুখেই তিনি মারা গেলেন। সুরেশ অসহায় হইয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বোম্বেটে সন্ন্যাসীর দল সুযোগ বুঝিয়া সুরেশের সাম্‌নে আচ্ছা এক ফাঁদ পাতিল, সুরেশ নিরুপায় হইয়া সেই ফাঁদেই পা দিল। বোম্বেটে সন্ন্যাসীরা তাহাকে কহিল,

"আহা ছেলেটি, তোমার মা বাপ কেউ নেই? তোমার দুঃখে আমাদেরও বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি আর কোথায় কার সঙ্গেই বা যাবে? তা এস, আমরাই তোমাকে হরিদ্বারে নিয়ে যাই। সেইখানে পাহাড়ের উপরেই আমাদের আশ্রম। আশ্রমে যতটা পারি, তোমাকে সুখে রাখ্‌তেই চেষ্টা কর্‌ব।"

সুরেশ বোম্বেটে সন্ন্যাসীদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া তাহাদের সঙ্গেই চলিল। সন্ন্যাসীরা সুরেশকে আপনাদের নৌকার ভিতরে লইয়া গেল এবং কহিল, "আর এই মেলায় থেকে কাজ নেই বাপু। প্রাণটা বাঁচ্‌লে তার পরে ত সব ধর্ম্ম কর্ম্ম। যে রকম কলেরা লেগেছে, আজই এখান থেকে পালিয়ে না গেলে, এই রোগের কর্ত্রী ঠাকুরাণীটি হয় ত আমাদেরই দুই একটাকে ধরে টানাটানি কর্‌বেন। ঠাকুরাণীটির কাঁচা মাংস ও তাজা রক্তের উপরে ভারি লোভ!"

সন্ন্যাসীরা নৌকা খুলিয়া হরিদ্বারের দিকে না গিয়া বক্‌সারের দিকে

চলিল; সন্ধ্যা হইতেই একটি নির্জ্জন স্থানে জঙ্গলের আড়ালে নৌকা বাঁধিল। রাত্রি এগারটার পরে সুরেশ ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি দুপুর হইলে পরে নদীতে নৌকা যাওয়া-আসা বন্ধ হইল। তখন, সন্ন্যাসীরা সুরেশের মাথা কাটিবার জন্য খাঁড়া বাহির করিল। কে বলিবে ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, ঠিক্ সেই সময়ে সুরেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে একজন সন্ন্যাসীর হাতে খাঁড়া দেখিয়াই মনে করিল, হয় ত সোনারূপার লোভে তাহাকে হত্যা করিবার জন্যই এই সব আয়োজন। সুরেশের বয়স চৌদ্দ বৎসর হইলেও শরীর খুব বলিষ্ঠ। সে পাহাড়ের লোকদের কাছে তীর ধনুকের খেলা শিখিয়াছিল। পাহাড়ের বনে জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার এবং তাহাদের চেয়েও হিংস্র বিস্তর অসভ্য আছে বলিয়া, সুরেশের গায়ের আলখেল্লার নীচে ছোট একটি পিতলের ধনুক ও কয়েকটি বিষ-মাখানো তীর লুকানো থাকিত। সুরেশ চোখের নিমিষে সেই ধনুক ও তীর বাহির করিল। সে যাত্রার দলের অভিমন্যুর মতন ঘুরিয়া ঘুরিয়া, বোম্বেটে সন্ন্যাসীদের চোখ লক্ষ্য করিয়া বিষাক্ত তীরের ফলাগুলি ছুঁড়িতে লাগিল। সেই তীরে দুই একটা বোম্বেটের চক্ষু নষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহাতে সুরেশের রক্ষা পাইবার কোনই সুবিধা হইল না। কয়েকটা বোম্বেটে পিশাচের মতন দাঁত বাহির করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল; অবশেষে যমদূতের মতন একটা বোম্বেটে খাঁড়া উঁচু করিয়া সুরেশের ঘাড়ের উপরে এক কোপ মারিল। সুরেশের সাম্‌নে একটা বাঁশ ছিল, সেই বাঁশ দিয়া সে খাঁড়ার কোপ অনেকটা ঠেকাইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ঠেকাইতে পারিল না; খাঁড়ার যে একটুখানি তাহার গায়ে লাগিল, তাহাতেই তাহার অনেকখানি মাংস কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সুরেশ ভীষণ চীৎকার করিয়া নৌকার মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। লোকেরা কথায় বলে, "ধর্ম্মের কল আপনি নড়ে।" যথার্থই ধর্ম্মের কল নড়িয়া উঠিল। একটু দূরে পুলিসের দারোগার একখানা

নৌকা যাইতেছিল। সুরেশের চীৎকার দারোগা বাবুর কাণে গিয়া পৌছিল। তাঁহার মাঝিরা তীরবেগে নৌকা চালাইয়া সন্ন্যাসীদের কাছে আসিতে লাগিল। তখন সন্ন্যাসীরাও প্রাণপণে নৌকার দাঁড় বাহিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দারোগা বাবুর নৌকা যখন সন্ন্যাসীদের নৌকার অনেকটা কাছে আসিল, তখন আট দশ জন পুলিস বন্দুক হাতে লইয়া দাঁড়াইল এবং স্বয়ং দারোগা বাবু বন্দুক হাতে লইয়া কহিলেন—"সাবধান! যেখানকার নৌকা সেখানেই রাখ! পালাতে চেষ্টা করলেই গুলি চালাব, তা হলে তোমাদের প্রাণ বাঁচানো মুস্কিল হবে।"

পুলিসের কনেষ্টবলেরা গুড়ুম গুড়ুম করিয়া চারি পাঁচটা বন্দুকের আওয়াজ করিল। সন্ন্যাসীরা ভয় পাইয়া নৌকা থামাইল। কিন্তু তাহারা খুব চতুর! পাছে বা সুরেশের সোনা রূপা সহিতই ধরা পড়ে, সেই জন্য সেগুলি এবং তাহাদের খাঁড়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল, দারোগা বাবু তাহাদের গ্রেপ্তার করিলেন। তখন দুষ্টু সন্ন্যাসীরা অম্লান বদনে মিথ্যাকথা তৈরী করিয়া দারোগা বাবুকে কহিল—

"বাবু, আমাদের ধরে দড়ি দিয়ে কেন হাত বাঁধলেন? আমরা কি ডাকাত? ডাকাত হলে সন্ন্যাসীর পোষাক পরব কেন? অনেক রাত হয়েছে, তাই নদীর তীরে নৌকা লাগিয়ে আমরা নিশ্চিন্তমনে ঘুমাচ্ছিলুম; তখন এই ছোক্‌রা চোর, আমাদের নৌকায় উঠে চুরি করবার চেষ্টা করছিল; আমরা তাড়াতাড়ি জেগে উঠে ঘুমের চোখে তার ঘাড়ে এক কোপ মেরেছি। দারোগা বাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও।"

চোর ডাকাত ধরিয়া দারোগা বাবুর মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে। মিথ্যাকথা বলিয়া এখন আর তাঁহার চোখে ধুলা দিবার যো নাই। তিনি বোম্বেটেদের বাঁধিয়া থানায় লইয়া গেলেন এবং সুরেশকে চিকিৎসার জন্য বক্‌সারের হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বকসারের হাঁসপাতালে সুরেশের চিকিৎসা হইতে লাগিল। অনেক-দিন পরে সে আরোগ্যলাভ করিল। তাহার শরীর একটু সবল হইল। হাঁসপাতালের ডাক্তার কহিলেন, "তোমাকে আজ্ই এই হাঁসপাতাল থেকে চলে যেতে হবে, আর এখানে থাকার সুবিধা হবে না।"

সুরেশ কহিল, "আমি কোথায় যাব? আমার ত কেউ নেই।"

বক্সারের ডাক্তার ঈশ্বরীপ্রসাদ বাঁদরের মত মুখভঙ্গী করিয়া সুরেশকে কহিল, "আহা কি মজার কথাই বল্লে! তোমার কেউ নেই, তবে কি আমারই ঘাড়ে চড়ে থাক্তে চাও নাকি?"

সুরেশ ডাক্তারের মুখভঙ্গী দেখিয়া আর সে হাঁসপাতালে থাকিতে সাহস পাইল না। বাহিরে আসিয়া সে কয়েকজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল, কোথাও একটু আশ্রয় পাইল না। তাহার পরে একটা বড় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কি ভয়ানক রোদ! হাওয়া যেন আগুনের মতন। সুরেশ আর কতটুকু রাস্তাই বা চলিবে? সে প্রকাণ্ড এক বট গাছের নীচে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই সে ঘুমাইল।

সুরেশ ঘুমের ভিতরে আশ্চর্য্য এক স্বপ্ন দেখিল। "সে যেন ঘুরিতে ঘুরিতে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরের এক জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে যে কোথায় যাইবে তাহাও বুঝিতে পারে না, কোথাও যাবার পথও দেখিতে পায় না। হঠাৎ তাহার সাম্নে প্রকাণ্ড এক হাতী আসিয়া দাঁড়াইল। হাতীর পিঠে চমৎকার হাওদা। হাওদার উপরে হাতীর মাহুত। মাহুত সুরেশকে কহিল, "খোকা বাবু, তুমি ত বেশ বড় হয়েছ। আমাকে কি চিন্তে পার? আমি যে রতন বাবুর হাতীর

মাহুত। কতবার তুমি এই হাতীতে চড়েছ, আমাকে অনেক পয়সা জলখাবার জন্য দিয়েছ।”

রতন বাবু ডিব্রুগড়ের একজন টাকাওয়ালা লোক। সুরেশের বাবার বাসার কাছেই তাঁহার বাড়ী ছিল। সুরেশ ছেলেবেলায় অনেক দিন ঐ হাতীতে চড়িয়া বেড়াইয়াছে। আজ সেই হাতী ও মাহুতকে দেখিয়া ছেলেবেলার অনেক কথাই তাহার মনে পড়িল। সে আর কান্না থামাইতে পারিল না। মাহুত কহিল, “তোমার দুঃখ ত আর থাক্‌বে না, তুমি কাঁদ কেন? এই হাতীর পিঠে উঠ্‌লেই, হাতী তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবে। হাতী তোমাকে খুব ভালবাসে কি না, তাই দেখ কেমন নীচু হয়েছে। তুমি হাতীর উপরে ওঠ না কেন?”

সুরেশ। আমার বাবা কোথায়?

মাহুত। ঐ যে দূরে দূরে সারি সারি নীল রঙের পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওর আড়ালে সোনার খনি ছিল। তোমার বাবা খুঁজে খুঁজে সেই খনির সন্ধান পেয়েছেন। মাটি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে খনির ভিতরে এক সোনার পাহাড় পাওয়া গিয়াছে। তোমার বাবা ত সেই পাহাড়ের উপরেই দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি তাঁর কাছে গেলেই তিনি তোমাকে নিয়ে পাথর দিয়ে সোনা ভেঙ্গে ভেঙ্গে, সেই সোনা নিয়ে সহরে চলে যাবেন।

সুরেশ হাতীর উপরে চড়িল। হাতী ছুটিতে ছুটিতে সোনার খনির কাছে গিয়ে দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিল, সোনার পাহাড় ঝক্ ঝক্ করিতেছে এবং তাহার উপরে যথার্থই তাহার বাবা দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি কোন কথা বলিলেন না, শুধু হাতে ইসারা করিয়া সুরেশকে কাছে যাইতে বলিলেন। কিন্তু হঠাৎ জঙ্গলের দুই দিক হইতে ভয়ঙ্কর দুই গণ্ডার বাহির হইল; হাতী ভয় পাইয়া ছুটিয়া চলিল। তাহার পরে হাতী যেখানে গিয়া দাঁড়াইল, সেখানে একখানি পাতার কুটীর। কুটীরের ভিতর হইতে বার বৎসর বয়সের একটি সুন্দরী বালিকা

বাহিরে আসিল। সে সুরেশকে কহিল, "অমন করে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলে কেন? চিন্‌তে পার্‌লে না? আমি যে তোমার বোন।"

সুরেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, তাহার খুব নিকটেই গাছের তলায় একটি ভিখারিণী মেয়ে! মেয়েটির মিষ্টি মুখখানি করুণায় ভরা। মেয়েটি সারং বাজাইয়া সুস্বরে গাহিতেছে—

"ওগো, তোমাদের কাছে কিছু পেতে চাই,
দিতেই ত আছে সুখ, নিতে সুখ নাই।
চেয়ে দেখ কূলে কূলে মধুর লহরী তুলে
তটিনী নির্ম্মল বারি দান করে তাই।
বনে তরু শত শত ফুল ফল দেয় কত,
পাখীর সুমিষ্ট গানে হৃদয় জুড়াই;
দিলে মন বড় হয়, স্বার্থে সুখী কেহ নয়,
তাই সবাকার মনে করুণা জাগাই;
ওগো, তোমাদের কাছে কিছু পেতে চাই।"

ভিখারিণী মেয়েটির বয়স'ও বার বৎসর হইবে। তাহার মধুর গান শুনিয়া, রাস্তার দয়াবান্ লোকেরা হাতে পয়সাটি, দু-আনিটি দিয়া যাইতে লাগিল। সুরেশ স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতে এবং বালিকার গান শুনিতে শুনিতে অশ্রুতে নয়ন সিক্ত করিল। ভিখারিণী মেয়েটি সুরেশের কাছে আসিয়া কহিল, "তুমি কে? গাছ তলায় এমন করে শুয়ে আছ কেন? মুখখানি যে শুক্‌নো, সমস্ত দিনে কিছুই খাওনি? চোখে যে জল! তোমার কি কেউ নেই?"

সুরেশ। না, আমার কেউ নেই।

সুরেশের কথা শুনিয়া মেয়েটির মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সুরেশ কোথা হইতে কেন এখানে আসিয়াছে, মেয়েটি তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সুরেশের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া মেয়েটি তাহার চোখের জল আর রাখিতে

পারিল না। সে কহিল, "আমিও বড় দুঃখিনী। আমার বাবা রেলের কাজ করতেন। জাতিতে বামুন ছিলেন কি না, তাই গাড়ীর যে সব যাত্রীদের পিপাসা পেত বাবা তাদের খাবার জল দিতেন। কিন্তু একবার গাড়ীর নীচে পড়ে গেলেন; বাঁচলেন বটে, কিন্তু পা দুখানি কাটা গেল। এখন ত তিনি বুড়োই হয়েছেন। আমরা হিন্দুস্থানী হলেও কয়েকটি বাঙ্গালী বাবু দয়া করে আমদের ছোট একটি বাড়ী তৈর করে দিয়েছেন। আমি রোজ গান গেয়ে ভিক্ষা করে কিছু পাই, তাতেই আমাদের দুজনের দিন চলে যায়। আমরা ভিক্ষুক হলেও বামুন ত বটে, চল না আমাদের বাড়ীতে; ভাত ডাল রান্না করে তোমাকে খেতে দেব।"

মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। সে সুরেশকে লইয়া নিজের বাড়ীতে বাপের কাছে গেল। তাহার বাবাও বড় ভাল মানুষ। সে সুরেশকে অতিশয় স্নেহের সহিতই গ্রহণ করিল। মেয়েটি অল্প সময়ের মধ্যেই ডাল ভাত রাঁধিয়া এবং আলু ভাজা করিয়া সুরশেকে খাইতে দিল। মেয়েটির বাড়ীখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুরেশ শুধুই একটি দিন ভিখারিণীর বাড়ীতে রহিল, এই একদিনেই বার বৎসর বয়সের মেয়েটির স্নেহ-দয়া কাজকর্ম্ম এবং তাহাকে বৃদ্ধ পিতার আশ্চর্য্য সেবা করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

একদিন পরে মেয়েটির বাড়ীতে বক্সারের এক ডেপুটি বাবু বেড়াইতে আসিলেন। মেয়েটির উপরে তাঁহার অত্যন্ত দয়া। তিনি সময় সময় তাহাকে কাপড়, জামা ও খাবার জিনিস দিয়া অত্যন্ত উপকার করেন আজ তিনি ভিখারিণীর কাছে সুরেশের কথা শুনিয়া, তাহার সহিত আলাপ করিলেন। সুরেশ কহিল, "আমি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়েছিলুম। এক সন্ন্যাসী আমাকে পুত্রের মতন পালন করেছিলেন। এলাহাবাদের কুম্ভ মেলায় সে সন্ন্যাসীরও মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে আমি ডাকাতের হাতে পড়েছিলুম। তারা আমার

সর্ব্বস্ব হরণ করে খাঁড়ার আঘাতে অজ্ঞান করে রেখেছিল। তার পরে এখানকার হাঁসপাতালে আশ্রয় লাভ করে সুস্থ হয়েছি। এখন আর আমার কোথাও যাবার জায়গাটুকুও নেই।"

ডেপুটি বাবু খুবই স্নেহ দেখাইয়া সুরেশকে আপনার বাসায় লইয়া গেলেন। সে সেইখানেই আশ্রয় লাভ করিল। কিন্তু বোম্বেটে ডাকাতদের কি হইল, এখন সংক্ষেপে সেই কথাই বলি।

পুলিসের দারোগা সন্ন্যাসীদের থানায় লইয়া গিয়া তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ী ঘর কোথায়?"

একটি চালাক লোক কহিল, "আমরা সাধুসন্ন্যাসী। আমাদের আবার বাড়ী ঘর কি? যে দিন পাহাড়ের উপরে থাকি, সে দিন সেই খানেই আমাদের আড্ডা।"

দারোগা। চুরি ডাকাতি করে যে সোনা রূপা পাও, তা রাখ কোথায়?

বোম্বেটে। চুরিডাকাতি করলে ত সোনারূপা পাব।

দারোগা। এ কোন্ জায়গায় এসেছ তা জান ত? এ স্থানটি হচ্ছে থানা, আমি হচ্ছি দারোগা। এখানে মিথ্যা বলে চোখে ধুলা দিলে চল্‌বে না। আমরা মানুষের পেটের মধ্যে ঢুকে নাড়ীর ভিতর থেকে কথা টেনে বের করি, তা মনে রেখ। যে ছেলেটিকে খুন করতে চেয়েছিলে, তাকে কোথায় পেয়েছ, সত্যি করে বল।

বোম্বেটে। কোথায় আবার পাব? ও ছোকরা আমাদের নৌকায় চুরি করতে এসেছিল।

দারোগা। তোমরা ত বল্‌ছ সন্ন্যাসী, ও ছোকরা কি তোমাদের জটাভস্ম চুরি করতে এসেছিল? কেন ওকে মারতে চেয়েছিলে, সব কথা ভেঙ্গে বল, নইলে ভাল হবে না।

বোম্বেটে। প্রাণ গেলেও আমরা মিথ্যা বলি নে।

দারোগা। ব্যাটা যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! দেখ্‌ছি সোজা আঙ্গুলে ঘি বের হবে না। ঘা কতক লাগাতে হবে, তা হলে সত্যাই কথা বের হয়ে পড়্‌বে।

বোম্বেটে। আপনারা মা বাপ, মার্‌লেও মার্‌তে পারেন, রাখ্‌লেও রাখ্‌তে পারেন।

দারোগা। মা বাপ আমরা কেমন, তা এখনি দেখাচ্ছি। রামদীন, ঐ যে ষোল সতের বৎসর বয়সের একটি ছোট সন্ন্যাসী, ওকে নিয়ে গারদ ঘরে চল ত।"

রামদীন ছেলেটিকে লইয়া একটা বিশ্রী ঘরের মধ্যে গেল। তাহার পরে দারোগা তাহার বাড়ীর ভিতর হইতে শিকলে বাঁধা এক ভীষণ কুকুর লইয়া আসিলেন। তাকে মোটেই কুকুর বলিতে ইচ্ছা হয় না, সে যেন ছোট খাট একটি বাঘ। ছেলেটিকে দেখিয়াই কুকুরটা ভয়ানক শব্দে ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। তাহার মুখের পানে চাহিয়া ছেলেটির গায়ে কাঁপুনি ধরিয়া গেল। দারোগা কহিলেন, "ওরে ছোকরা, সত্যি করে বল, তোরা চোর না ডাকাত? মিথ্যা বল্লে এখনি এই কুকুর লিলিয়ে দেব, তোর হাড় মাংস টেনে টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।"

ছেলেটি ভয় পাইয়া কহিল, "আমরা চুরি ডাকাতি করি, আমাদের বাড়ী ভোজপুরে।"

দারোগা সবগুলি চোর ডাকাতকে গারদ ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তার পরে তিনি বিস্তর পুলিস লইয়া ডাকাতদের গাঁয়ে উপস্থিত হইলেন। ডাকাতদের বাড়ীঘর ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহাদের কাঠের সিন্দুকের মধ্যে নানা জায়গার ডাকাতির জিনিস পত্র ও গহনা প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে জজ সাহেবের কাছে ডকাতদের বিচার হইল। সকল ডাকাতেরই জেল হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডেপুটি বাবু দেখিলেন, সুরেশের চৌদ্দ বৎসর বয়স হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজের রীতিনীতি যতটুকু জানা আবশ্যক, তাহা সে জানে না। সে বড় সরল। অথচ তাহার ভিতরে শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। সে সন্ন্যাসীর কাছে চমৎকার সংস্কৃত শিখিয়াছে; লেখাপড়া শিখাইলে সে সবই খুব ভাল শিখিতে পারিবে। তাই ডেপুটি বাবু সুরেশকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

কিন্তু এই সময়ে ডেপুটি বাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী ঠাকুরাণী বাপের বাড়ীতে ছিলেন; তিনি এক মাস পরে বক্সারের বাসায় আসিলেন। সুরেশকে দেখিয়া প্রথমে ত রাগিয়া চক্ষু রাঙা জবার মত করিয়া বলিলেন, "কোথাকার একটা বে-ওয়ারিশ ছেলে হঠাৎ উড়ে এসে আমার ঘরখানি জুড়ে বসেছে!"

তাহার পরে গিন্নিঠাকুরাণীর মাথায় চট্ করিয়া একটা বুদ্ধি খেলিল। তাই তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—ছোকরা ত শুন্‌ছি বামুনের ছেলে। বয়সের তুলনায় শরীরে বেশ শক্তি-সামর্থ্যও আছে। যদি রান্নাবান্না শেখানো যায়, তাহলে ত ছোকরা বেশ কাজে লাগ্‌তে পারে। ওকেই ত আমরা বামুনঠাকুর করে কিছু মাইনে দিতে পারি। আরে বাপ্‌রে বাপ! এ দেশের গোঁফওয়ালা কড়া মেজাজ বামুনগুলোর সঙ্গে কি পেরে ওঠ্‌বার যো আছে? খাবার সময় খাবে ত এক হাঁড়ী ভাত, আধ সের ডাল। আবার বাড়ী যাবার সময় কর্‌বে চুরি। রান্নার সময় ফোড়ন দিতে গিয়ে তরকারি দিবে জ্বালিয়ে, কাঁচা তেলে রাঁধ্‌বে মাছের ঝোল। কিছু বল্লেই গোখ্‌রো সাপের লেজে পা দেওয়া হবে, অম্‌নি সে ফোঁস করে উঠে দু-কথা শুনিয়ে দেবে। তা আমিও সহজে

ছাড়্‌বার পাত্রী নই, মাইনে হতে তিন ভাগের এক ভাগ কেটে রেখে তখনি ঐ আপদকে বিদায় করে দি।"

আসল কথা গিন্নিঠাকুরাণীর মুখে ক্ষুরের ধার। চাকর বামুনের কাজে সামান্য একটু ত্রুটি হইলেই মুখের এমন বুলি বাহির হয়, তাহাতে লোকের হাড় মাংস কাটিয়া যায়। তাই ঠাকুরাণীটির বাসায় সাত দিনের বেশি কোন রান্না করিবার বামুনই টিকিয়া থাকিতে পারে না। তা, এই অসহায় ছেলেটিকে রাতারাতি গড়িয়া [illegible] রান্নার কাজে লাগাইতে পারিলে মাইনে ত লাগিবেই না; তা ছাড়া, দিনরাত মুখচালানো, কাজ আদায় করা, এই দুইয়েরই ব্যাঘাত ঘটিবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

গিন্নি মনে মনে এই [illegible] করিয়া প্রকাশ্যে ডেপুটিবাবুকে কহিলেন—"[illegible] নিজের এক পাল ছেলে মেয়ে, তাদের [illegible] সামলাতে পারি নে, আবার সখ করে পরের ছেলেকে [illegible] আনা কেন? তবে যদি বল ওর ত কেউ নেই, [illegible] যাবে কোথায়? তা যদি নিতান্তই এখানে থাকে ত রান্নাবান্না শিখুক না কেন? বামুনের ছেলে ত বটেই, বয়স অল্প হলেও গায়ে জোর আছে। আমাদের রান্না [illegible], পড়াশুনাও শিখুক। তা নয় ওর কেতাব পত্রের জন্য অল্প কিছু মাইনে ধরে দেওয়া যাবে।"

ডেপুটি বাবু জিভ কাটিয়া বলিলেন—"আরে ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে? ওর বাপ যে মস্তবড় চাকুরি কর্‌তেন। তাঁর ঘরে ঢের চাকর ও রাঁধুনী ছিল। ওকে কি রসুয়ে বামুন করে রাখা যায়?"

গৃহিণী কহিলেন—"শুন্‌তে পাই তোমাদেরও পূর্ব্বপুরুষদের জমিদারী ছিল। এখন সেই অহঙ্কারে চাকুরি না করে দিব্বি পায়ের উপরে পা রেখে বড় মানুষের মত দিন কাটাতে চাইলে বেলা দশটার সময় ভাত, মাছের ঝোল আর ঘন দুধ, তার পরে রাত্তিরে আবার লুচি, মাংস মিষ্টান্ন আস্‌ত কোথা থেকে? ছেলেটির বাপ বড় লোক ছিল ত ছিলই; এখন

সে কথা নিয়ে বড়াই করে লাভ কি? ওকে আমাদের রান্নার কাজটি কর্‌তেই হবে, নইলে থালা ভরে একরাশ অন্ন আর বস্ত্র যোগাবে কে?

ডেপুটি বাবুর মন বড়ই দুর্ব্বল, তাই গিন্নির কথার মতনই কাজ হইল। সুরেশ তিন মাসের মধ্যেই চমৎকার রান্না করিতে শিখিল। তাহার পরে সে রীতিমত বামুনঠাকুর হইল। সে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া রাঁধিয়া স্কুলে যাইত এবং পড়িত।

কিন্তু সুরেশের এই পরিবারে কষ্টের আর সীমা রহিল না। ডেপুটি বাবুর একটি সেয়ানা চাকর আছে, তাহার নাম গিরুয়া। এই চাকরটি বড় ভয়ানক। সত্য কথা যে কেমন করিয়া বলিতে হয়, সে শিক্ষা যেন তাহার হয় নাই। চুরি করিতে পারিলে সে আর ডান দিকে বাঁ দিকে ফিরিয়া চায় না। তবে, এই বাড়ীর গিন্নির চোখে ধূলি দিয়া চুরি-করা কাজটিও বড় সহজ নয়। এখন অসহায় সুরেশকে পাইয়া সে বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিল। গিরুয়া নিজে যে সব অন্যায় কাজ করিত, তাহা সুরেশের মাথায় চাপাইয়া দিত। রান্নাঘরের দ্রব্যসামগ্রী বিষয়ে একটা কিছু অন্যায় কাজ হইলেই, গিরুয়া সুরেশকেই দোষী সাব্যস্ত করিত আর তাহার অপরাধের কথা, গিন্নির কাছে এমন করিয়া ইনাইয়া, বিনাইয়া ও বানাইয়া বলিত, যেন সে পরম সাধু, আর যত নষ্টের গোড়া ঐ সুরেশ ছেলেটি।

বক্সারে দুধ বড় সস্তা। তা ছাড়া ডেপুটি বাবুর ছেলেমেয়েও ত কম নয়; তাই গিন্নি মস্ত বড় কড়াই ভরিয়া দুধ রাখেন। সুরেশ যখন সেই খাঁটি দুধ কড়াইতে জ্বাল দিয়া রাখিয়া দেয়, তখন এমন পুরু সর পড়ে যে, দেখিলে অনেকেরই লোভ সামলানো মুস্কিল হয়। বিকাল বেলায় স্বয়ং গিন্নি সেই সর কড়াই হইতে তুলিয়া ছেলেমেয়েদের জলখাবার লুচি ও বেগুন ভাজার সঙ্গে খাইতে দেন। কিন্তু আজ কাল প্রায়ই দুধের সর দেখিতে পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া দেখা যাইবে? চাকর

গিরুয়ার চুরিবিদ্যার যাদুমন্ত্রে যে সেই দুধের সর তাহার মুখের ভিতর দিয়া গিয়া পেটের মধ্যে ঢোকে। আবার গিরুয়া নিজেই গিন্নিকে গিয়া বলে—"মা, আপনাকে বল্লে আপনি বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি নিজে রান্নাঘরের বাইরে লুকিয়ে থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখেছি, আজ বামুনঠাকুর দুধের সমস্ত সরখানাই তুলে নিয়ে নিজেই তা খেয়েছে।"

গিন্নি সুরেশকে কাছে ডাকেন, তার পরে জিজ্ঞাসা করেন—"হাঁ গা বামুনঠাকুর, সত্যি করে বল, তুমি কি দুধের সর চুরি করে খেয়েছ?"

সুরেশ ত এই জঘন্য কথা শুনিয়াই অবাক্ হইয়া যায়। ছি! ছি! তাহার প্রাণ গেলেও সে কি এমন ঘৃণিত কাজ করিতে পারে? তাহার পরে সুরেশের এমন কান্না পায়, সে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তখন গিন্নি তাহার বিষ মাখানো ভাষায় গালাগালি করিতে থাকেন। ছেলেটির দুই চোখ দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া জল পড়িতে থাকে। গিন্নি বলেন—"আহাম্মক, ধরা পড়েছে কি না, তাই এই কান্না!"

চাকর গিরুয়ার মাসে মাইনে বটে সাত টাকা, কিন্তু সে যখন রাত্রে কল্কা পেড়ে ধুতি পরিয়া, সুন্দর ছিটের জামা গায় দিয়া, পান খাইয়া, ঠোঁট রাঙ্গা করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে ফূর্ত্তি করিতে বাহির হয়, তখন কে বলিবে সে কুয়া হইতে জল তুলিবার, ডেপুটি বাবুর গায়ে তেল মাখিবার, বাজার হইতে মাছ তরকারি কিনিবার চাকর! মনে হয় সে যেন ডেপুটি বাবুরই অতি নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়! কাজেই এই বাবুগিরির দায়ে পড়িয়া তাহার চুরি করিতে হয়। কিন্তু আগে কাত্যায়নী দেবীর কাছে ধরা পড়িবার ভয়ে গিরুয়ার চুরি করিতে বুক কাঁপিয়া উঠিত। এখন ভাল মানুষ সুরেশকে পাইয়া তাহার চুরি করিবার বেশ সুবিধাই হইয়াছে।

কাত্যায়নী দেবী নিজেই ভাঁড়ার ঘরের তালা খুলিয়া সুরেশকে রান্না করিবার চাল, ডাল, তেল, ঘি ও মস্‌লা বাহির করিয়া দিয়া যান। কিন্তু দরকারি কাজের জন্য সুরেশ একটু রান্না ঘরের বাহিরে গেলেই বিপদ।

সেই সময়ে গিন্নিয়া কিছু চাল, কিছু ডাল, কিছু তেল, কিছু ঘি চুরি করিবেই। তাই এক এক দিন খাবার সময় ভাত কম পড়িয়া যায়, ডাল তরকারিতে ভাল রকম ঘি মস্‌লা পড়ে না, খাবার জিনিসের সুস্বাদ হয় না। ইহা লইয়া প্রায়ই একটা হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। গিন্নি রাগিয়া বাঘিনীর মতন গর্জ্জন করিয়া বলিতে থাকেন—

"বামুন ঠাকুর, আমি নিজের হাতে চাল মেপে দিলুম, তবু ভাত কম হল কেন? অত তেল, ঘি, মস্‌লা তোমাকে দি, তবু তরকারির ভিতর ঘি মস্‌লার স্বাদ পাওয়া যায় না কেন? ডাল তরকারিগুলো কি ছাই হয়েছে, একবার মুখে দিয়ে দেখ ত! তুমি না সন্ন্যাসীর কাছে থাক্‌তে? তিনি বুঝি তোমাকে ধর্ম্মকর্ম্ম না শিখিয়ে এই চুরি বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন? আমি বল্‌ছি, তুমি এখনও সাবধান হও, নইলে একদিন তোমার হাত বেঁধে দরোয়ান দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেব। সেখানে পুলিসের গুঁতো খেলে একদিনেই তোমার চুরিবিদ্যা দূর হয়ে যাবে।"

অসহায় সুরেশ নির্জ্জনে একলাটি বসিয়া শুধুই কাঁদে আর বলে—যে জঘন্য কাজের কথা মনেও ভাব্‌তে পারি নে, এই বাড়ীর লোকেরা কি না সেই কাজই আমি করেছি বলে বিশ্বাস করে? আমি ত কোন অন্যায় কাজই করি নে। পরিশ্রম করে এঁদের রান্নাবান্না করতেই চেষ্টা করি, তবু এরা যখন তখন আমাকে গালাগালি দেয় কেন? তবে কি আমি শুধু দুঃখ সইবার জন্যই জন্মেছি? আর ত আমি দুঃখ সইতে পারি নে। আমার যারা আপনার ছিলেন, তারা সকলেই মারা গেলেন, আমার কেন মৃত্যু হয় না? হায়, আমি আর কত দুঃখ সহ্য করব?"

সুরেশের মন যখন ব্যথায় ভরিয়া উঠে, তখনি সে তাহার স্বপ্নের কথা ভাবিতে থাকে। আজ সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল—"স্বপ্ন কি সত্য? সত্য হতেও পারে। হয় ত নদীতে নৌকা ডুবে যাবার পরে বাবা সাঁতার দিয়ে তীরে উঠেছিলেন। তীরে উঠে আমার

একটি বোনকেও খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকেও যে কত দিন কত মাস ধরে খুঁজেছেন, তা কে জানে? আমাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে হয় ত মনের কষ্টে আর তিনি ডিব্রুগড় ফিরে যান নি। আমার উপরে তাঁর যে বড়ই ভালবাসা ও আশা ভরসা ছিল। বাবা ডিব্রুগড় ফিরে না গিয়ে নিশ্চয়ই সোনার খনির সন্ধান করেছেন। কে বল্‌বে, কত দিন খুঁজে খুঁজে কত পরিশ্রম করে সোনার খনি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু খনি আবিষ্কার কর্‌লেই বা কি হবে? তিনি যে একলা। কেমন করে সোনার পাহাড় থেকে সোনা ভেঙ্গে ভেঙ্গে সহরে নিয়ে যাবেন? তাই হয় ত মনে মনে ভাব্‌ছিলেন, আজ যদি সুরেশ বেঁচে থাক্‌ত, আর তাকে কাছে পেতুম, তা হলে আমার কাজের কতই সুবিধা হত। তিনি এই কথা মনে ভেবেছেন বলেই হয় ত তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি।"

সুরেশ মনে মনে কি যেন চিন্তা করিল। তার পরে আবার মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমার বোন্‌কে স্বপ্নে দেখ্‌লুম কেন? হয় ত বাবাই জঙ্গলের ভিতরে একখানি ছোট ঘর তৈরী করে, সেখানে তাকে রেখেছেন। আমার বোনই হয় ত রান্না করে বাবাকে খাওয়ায়।

"কিন্তু আমার বোন ঐ জঙ্গলে একলা থাকে কি করে? হয় ত আমার মাও বেঁচে আছেন। তাঁকে বাবা নদীর তীরে অথবা আর কোথাও পেয়েছিলেন। মা-ই আমার বোনটিকে নিয়ে ঐ ছোট ঘরখানিতে বাস করেন। আমার মায়ের যে খুব সাহস।

"তবে কি যথার্থই আমার মা বেঁচে আছেন? একটিবার—শুধুই একটিবার আমি যদি মাকে দেখ্‌তে পাই, তা হলে যত দুঃখ পেয়েছি, তাকে ত দুঃখ বলেই মনে হবে না। আমার মায়ের মতন এমন মা আর কারই বা আছে? সমস্ত সহরের মানুষ তাঁর প্রশংসা কর্‌তেন। স্নেহ ও দয়ায় যেন তাঁর সমস্ত হৃদয় পূর্ণ ছিল। বাবা, বিস্তর টাকা

উপার্জ্জন করতেন, মা দুই হাত ভরে টাকা দিয়ে মানুষের দুঃখ দূর করতেন। আমি কি আমার মার কথা স্মরণ করে চোখের জল না ফেলে থাকতে পারি ?"

সুরেশ যখন তাহার মার কথাই শুধু ভাবিতেছিল, তখন সেই ভিখারিণী মেয়েটি পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধের ফরমাস অনুসারে সারং বাজাইয়া গাহিতেছিল—

খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়াই,
কোথায় আমার মা ? কোথায় আমার মা ?
নয়নের জল যায় যে ঝরে, বারণ মানে না।
ওগো, পথের পানে আছি চেয়ে কবে মায়ের দেখা পেয়ে,
ব্যথা আমার চলে যাবে, কেউ তা জানে না।
কোথায় আমার মা ?"

এ গানটি বুড়াদেরই শুনিবার মতন। এখানে ঈশ্বরকেই মা বলা হইয়াছে। কিন্তু সুরেশ মানুষ মায়ের কথাই বুঝিল। তাই গান শুনিতে শুনিতে তাহার মন আরো ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সে ভাবিল, যদি আকাশের পাখী হইতে পারিতাম, তবে এখনি উড়িয়া সোনার খনির সন্ধানে যাইতাম। সেখানে বাবার সঙ্গে ত দেখা হইতই, হয় ত আমার মাকেও দেখিতে পাইতাম।

—*—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুরেশ যে ডেপুটি বাবুর বাসায় রান্না করে, তাঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নরেন্দ্র বাবুর এক দাদা আছেন। তাঁহার নাম নগেন্দ্রনাথ, তিনি দার্জ্জিলিং সহরের তিন মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপরে বাস করেন। সেই পাহাড়টি বড় সুন্দর। সেখানে নগেন বাবুর চা-য়ের বাগান আছে। তিনি বেশ টাকাওয়ালা লোক। তাঁহার বাড়ীখানিও বড় চমৎকার। বাড়ীর একদিকে পুষ্পোদ্যান, পুষ্পোদ্যানের সামনে একটি লতাকুঞ্জ। আবার আর একদিকে একটি ঝরণা রূপার মতন স্বচ্ছ জলরাশি বুকে লইয়া, ঝর্ ঝর্ শব্দ করিয়া, নীচু হইতে নীচুতে নামিয়া কোন্ সাগরের পানে যে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাড়ীর চারিদিকেই সারি সারি বৃক্ষ, তাহার শাখায় শাখায় কত রকম যে পাখী, পাখীর কণ্ঠে কত যে সঙ্গীত, তাহাও বর্ণনা করা যায় না। নগেন বাবুর বাড়ীর একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে চা-য়ের গাছগুলি যে কি সুন্দর, তাহাও চোখে না দেখিলে বুঝানো যায় না।

এই সুন্দর স্থানে নগেন বাবুর গৃহের একটি সুন্দর কুঠুরিতে বসিয়া তাঁহার মেয়ে সরলা কাঞ্চন-জঙ্ঘা দেখিতেছিল। তাহার অনুপম শোভা দেখিতে দেখিতে সে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতন সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও কিছু আছে কি না, তাহা কে বলিবে? দূরে দূরে নীল রঙের পাহাড়গুলি আকাশে যেন মাথা ঠেকাইয়া আছে, সেই পাহাড়ের উপরে রাশি রাশি বরফ জমিয়া রহিয়াছে; সেই বরফের উপরে সূর্য্যের আলোক পড়ায় দেখিতে এমনই সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, যে দেখিয়া মনে হয় যেন দূরে এক জ্যোতির্ম্ময় মায়াপুরী শোভা পাইতেছে। ইহারই নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। সরলা যখন এই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে দেখিতে মনে মনে কত কি ভাবিতেছিল, তখন তাহার বাবা নগেন বাবু আসিয়া তাহাকে কহিলেন—

"সরলা, তুমি কি চিন্তা কর্‌ছিলে বল দেখি ?

সরলা। বাবা, তুমি অনুমান করে বল না, আমি মনে মনে কি ভাব্‌ছিলাম ?"

বাবা। আচ্ছা, শোন তবে বলি। তুমি ভাব্‌ছিলে ঐ সাম্‌নের বাগানের হরিত্‌ রঙের গোলাপফুলটিই বেশি সুন্দর, না তোমার মুখখানিই বেশি সুন্দর !

সরলা। নিজের মুখখানাই দেখ্‌তে খুব ভাল, না ফুল্‌টিই দেখ্‌তে খুব ভাল,—সেই কথা বুঝি বসে বসে কেউ ভাবে ?

বাবা। তা, প্রথম বারে ভুল হয়ে গেল। দেখ, দ্বিতীয় বারে তোমার মনের কথা কেমন ঠিক্‌ বলে দিচ্ছি। তুমি ভাব্‌ছিলে, এই কাঞ্চনজঙ্ঘাটা যদি পরীদের দেশ হত, আর যদি সেখানে সাতমহলা সোনার দালানে পরীদের রাণী সোনার সিংহাসনে বসে থাক্‌তেন, এবং সে জায়গায় শূন্যের উপরে যদি একটি উদ্যান থাক্‌ত, আর সেই উদ্যানে যদি হীরার গাছে মুক্তা ফল ফলত ; আর তুমি যদি এখনি সেই পরীদের দেশে যেতে পারতে, আর পরীদের রাণী যদি তোমার গলায় একটি মুক্তাহার পরিয়ে দিতেন তা হলে সুখে তোমার মন ভেসে যেত।

সরলা ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার পরে কহিল—"আমি কি এখনো সাত আট বছর বয়সের ছোট একটি মেয়ে যে, রূপকথা শুনে বসে বসে শুধুই পরীদের দেশের যত সব আজগুবি কথা ভেবে ভেবে মাথা ঘামাবো ?

বাবা। কি ভাব্‌ছিলে তবে তুমিই বল।

সরলা। আমিই বল্‌ছি। কাল আমার জন্মদিনে মা ভালবেসে কত জিনিসই আমাকে উপহার দিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে যে ছোট একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন, সেইটির কথাই ভাব্‌ছিলাম। মা লিখেছেন—

"সাজ সজ্জ ক্ষুদ্র সুখ ম্লান করে শুভ্র মুখ,
বিলাসিতে বাড়ে দুখ মানব জন্মের।
শ্রমে, কার্য্যে, অধ্যয়নে শক্তি আসে দেহ মনে,
স্নেহ দয়া প্রতিক্ষণে করে পুণ্য দান;
ধর্ম্মই এ ধরণীতে পারে সুখ শান্তি দিতে,
জানিবে মা, সেবাব্রতে নারীর সম্মান।"

কি চমৎকার কথা! মা হয় ত এই কথার মতনই আমার জীবনটি দেখ্‌তে চান।"

নগেন্দ্র বাবু কহিলেন—"তুমি ঈশ্বরের নিকটে প্রর্থনা কর, তিনি যেন তোমাকে তোমার মায়ের মনের মতন করেই গড়ে তোলেন।"

এই সময় ডাকঘরের পিয়ন আসিয়া কহিল—"বাবু, আপনার চিঠি আছে।"

নগেন বাবু পিয়নের হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া মনে মনে পড়িলেন। তাহার পরে কহিলেন—"সরলা, এ যে তোমার কাকা বাবুর চিঠি। নরেন তোমার কাকীমা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে আজই মেলট্রেণে দার্জ্জিলিং এসে পেঁ)ছিবেন।"

সরলার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "বাবা, তোমার কথা শুনে সুখে আমার মন নেচে উঠ্‌ছে। আমি কাকাবাবু, কাকীমা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের গল্পই শুন্‌তে পাই, এত বয়স হয়েছে, তবুও একটিবার তাঁদের দেখ্‌তে পাই নি। কেমন করেই বা দেখ্‌তে পাব? তাঁরা এখানে এলে ত?"

সরলা ছেলেবেলা হইতে নগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ্গের এই পাহাড়েই থাকে। এখানে সাহেব মেম ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী থাকেন না। সরলা মেমদেরই স্কুলে পড়ে, সাহেবদের ছেলেমেয়েদেরই দেখিতে পায়; নিজের আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানই নাই।

নগেন বাবু বেলা দুইটার সময়ই সরলাকে সঙ্গে লইয়া দার্জ্জিলিং ষ্টেসনে চলিলেন। বেলা চারিটার সময় মেল ট্রেণ ধীরে ধীরে ষ্টেসনে আসিতে লাগিল আর সুখে যেন সরলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, কাকীমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাহার কিছুদিন খুব সুখেই কাটিয়া যাইবে।

মেলট্রেণ ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। নগেন বাবু ভাইকে এবং ভায়ের ছেলেমেয়েদের যত্ন আদর করিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। তাঁহারা সকলেই নগেন বাবুর বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কমলা দেবী হর্ষোৎফুল্ল নয়নে সবাইকে আদর আপ্যায়িত করিয়া লুচি, তরকারি, মিষ্টান্ন ও ফল জলখাবার দিলেন। কিন্তু সরলার হাসিমাখা মুখখানি ম্লান হইয়া পড়িল, তাহার সকল সুখের কল্পনা মনের মধ্যেই মিলাইয়া গেল। সরলার কাকীমা এবং কাকীমার ছেলেমেয়েরা তাহার সঙ্গে যে হাসিমুখে কথা কহিবে, অথবা তাহাকে যে একটু ভালবাসা দিবে, তাহা ত দূরের কথা, বরং তাহারা অনেকেই এমন এক দৃষ্টিতে সরলার পানে চাহিতে লাগিল, সে দৃষ্টির ভিতরে শুধুই হিংসার বিষ; সে দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার প্রাণ শুকাইয়া যায়। সরলা ভাবিতে লাগিল, "আমি কি এঁদের কাছে কোন রকম অপরাধ করেছি? এঁরা আমাকে এমন হীনভাবে দেখ্ছেন কেন? আমি কেমন করেই বা অপরাধ কর্‌ব? কোনদিন ত এঁদের চোখেও দেখি নি।"

নরেন বাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী এবং তাঁহার ছেলেমেয়েদের সরলার উপরে এই হিংসা ও বিদ্বেষ কেন? তবে কি ইহার ভিতরে কোন গুপ্তকাহিনী লুকানো আছে? আছে বই কি! আমরা একটু সুবিধা পাইলেই সে কথা খুলিয়া বলিব।

সরলার কাকীমার ছেলেমেয়েরা তাহাকে যে ভাবেই দেখুক না কেন, সে তাহাদেরই ভাল করিয়া খাওয়াইবার জন্য রান্নাঘরে মায়ের

কাছে গেল। তাহার মা ও বামুনঠাকুরাণী নানারকম উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী রান্না করার আয়োজন করিতেছিলেন। সরলা তাহার মাতাকে কহিল—"মা, তোমার শরীরটা ত আজ তত ভাল নয়, তুমি কাকীমাদের কাছে গিয়ে কথা বল না, আমিই বামুনঠাকুরাণীর সঙ্গে থেকে রান্নাবান্নার আয়োজন করে দি।"

মা। তুমি কি তা কর্‌তে পার্‌বে? অনেক রকম জিনিস যে রান্না করতে হবে। তোমার কাকীমার ছেলেরা রাত্রে খায় লুচি, তার সঙ্গে মাংস ত চাই-ই। কাকীমা সুজির রুটি আর মাগুর মাছের ঝোল খান, তা ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর সহ্য হয় না।

বামুনঠাকুরাণী। এই রাত্রে মাগুর মাছ আবার কোথায় পাওয়া যাবে?

বামুনঠাকুরাণীর কথা শেষ হইতে না হইতেই কাত্যায়নী দেবী তাহাদের বামুনঠাকুরকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বামুনঠাকুরটি কে, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? সে যে আমাদেরই চিরদুঃখী সুরেশ। সুরেশ সরলাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! সে যে স্বপ্নে সোনার পাহাড়ের নিকটে বনের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখেছিল, যে মেয়ে বলেছিল, আমাকে কি তুমি চিন্‌তে পার না আমি যে তোমার বোন; এই সরলা ত ঠিক সেই মেয়েটির মতন। সুরেশ অবাক্ হইয়া নীরবে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। কাত্যায়নী দেবী কহিলেন—"এইটি আমাদের বামুনঠাকুর। আমার জন্য সুজির রুটি আর মাগুর মাছের ঝোল এই বামুনঠাকুরই তৈরী কর্‌বে, নইলে অন্য রাঁধুনী খানিকটা লঙ্কাবাটা আর অনেকখানি মস্‌লা দিয়ে ঝোল তৈরী কর্‌বে, আমি ত মুখের কাছেও নিতে পার্‌ব না।"

কাত্যায়নী দেবী ত এই কথা বলিয়াই সরিয়া পড়িলেন। কমলা দেবী অল্পক্ষণ সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার কোমল হৃদয় স্নেহে ভরিয়া উঠিল। তিনি সুরেশকে কহিলেন—"আমি নিজের হাতে

সুজির রুটি আর মাছের ঝোল তৈরী করব, তোমাকে রান্না করতে হবে না। তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমার থাকবার জন্য একটি ঘর ঠিক্ করে দিচ্ছি।"

সুরেশ কমলা দেবীর সঙ্গে চলিয়া গেল। বামুনঠাকুরাণী সরলাকে কহিল—"তোমার কাকীমাদের খাওয়া দাওয়া ত নবাবী রকমের ; ঐ ঠাকুরটি কি সব রান্না করতে পারে? আহা, ছেলেটির বুঝি কেউ নেই? থাকলে কি এই কাঁচা বয়সে দু-বেলা উনানের কাঠ ঠেলতে আসে? ওর চেহারাটি যেন রাজার ছেলের মতন। যেন দেবতার ঘরে জন্মেছিল, কোন্ মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীছাড়া মানুষের কাছে এসে পড়েছে। কি বলব? ওর দুঃখেভরা মুখখানির পানে চাইলে যেন বুক ফেটে যায়। আজ যদি আমার ছেলে অমূল্য বেঁচে থাকৃত, তবে এই ছেলেটির মতনই আঠার উনিশ বছরের হতো।"

কমলা দেবী ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—"সরলা, ওদের বামুনঠাকুর এই শীতের দেশে এসেছে, অথচ তার এক গরমটি জামা কি গায়ের গরম কাপড় নেই। ওর যে আজ রাত্রেই শীতে ভয়ানক অসুখ করবে। আমার বড় র‍্যাপার আর গরম কম্বলটা নিয়ে এস ত ; ছেলেটিকে এখনি দিয়ে আসি।"

সরলা র‍্যাপার আর কম্বল আনিয়া মায়ের কাছে দিল। তাহার মাতা উহা সুরেশকে দিয়া আসিলেন। সুরেশ রাত্রে শুইয়া ভাবিতে লাগিল— "আমি ত রান্না করবার বামুনঠাকুর, আমি লোকের জুতো লাথির নীচেই বাস করি। আমাকে ত কেউ ভালবাসে না। ভালবাসা ত দূরের কথা, আমার পানে কেউ দয়া করে ফিরেও চায় না। তবু কমলা দেবী স্নেহ প্রকাশ করে গরম র‍্যাপার আর কম্বল এনে দিলেন কেন? ভয়ানক শীতে আমার যদি মৃত্যুই হত, তাতে কমলাদেবীর কি আসত যেত? তাঁর মেয়েকেই বা আমার বোন বলে কেন স্বপ্নে দেখেছিলুম? স্বপ্ন সবই মিথ্যা। আমার বাপ নেই, মা নেই, বোন নেই, কেউ নেই ; শুধু আমিই দুঃখ সইবার জন্য বেঁচে আছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রে সরলার শুইতে একটু দেরি হইয়াছিল, তাই সে একটু বেশী বেলায় উঠিল। উঠিয়া দেখিল, সে জন্মিয়া অবধি যে সকল ব্যাপার কখনই দেখে নাই, সেই সকল ব্যাপারই তাহাদের বাড়ীতে ঘটিতেছে।

প্রথম ব্যাপারটি এই যে, সরলার কাকীমার ছেলে নীরদ আপনার ছোট বোন নলিনীকে ক্ষেপাইবার জন্য বলিয়াছে, "রাগ করো না নলিনী, রাঙা মাথায় চিরুনী, বর আস্‌বে এখনি।" নলিনী এই কথা শুনিয়াই নীরদের কাপড় ছিঁড়িয়া দিয়াছে। নীরদ ঠাস্ করিয়া নলিনীর গালে এক চড় মারিয়াছে। তাই নলিনী কখনো কাঁদিতেছে, কখনো বলিতেছে,—"হত-ভাগা, লক্ষ্মীছাড়া। সে দিন লুকিয়ে সন্দেশ চুরি করে খাচ্ছিল, আমি দেখ্‌তে পেলুম; তখন আমায় বল্লে, লক্ষ্মী বোনটি, তুমি মাকে সন্দেশ চুরির কথা বল না, তা হলে তোমায় খুব ভাল বাস্‌ব। আর আমাকে ক্ষেপাচ্ছেন, ধরে মার্‌ছেন; চুরির কথা বলে দেব না?"

দ্বিতীয় ব্যাপারটি, নীরদের সঙ্গে এক ভুটিয়া স্ত্রীলোকের বিবাদ। আমরা স্বীকার করি, সেই খোঁড়া, সেই বেঁটে ভুটিয়ানীর ভাবভঙ্গী দেখিলে দুষ্ট ছেলেদের একটু কৌতুক করিবার লোভ সামলানো কিছু মুস্কিল হইয়া পড়ে। কিন্তু লোভ সামলাইতে না পারিলেও যে বিপদ কম নয়, তাহা একবার নীরদের কথায়ই বুঝিয়া দেখ। সে খোঁড়া ভুটিয়ানীকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া কহিল—"খোঁড়া, ল্যাং ল্যাং, কার বাড়ীতে গেছ্‌লি খোঁড়া, কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং?"

ভুটিয়ানী এই ছড়ার ভাষা বুঝিলে হয় ত ততটা হাঙ্গামা করিত না। কিন্তু সে কতকগুলি ল্যাং ল্যাং শব্দ শুনিয়া মনে ভাবিল, না জানি এই বাঙ্গালী ছেলেটা আমাকে কি বিশ্রি গালাগালিই দিচ্ছে। তাই সে

তাহার হাতের লাঠি উঁচু করিয়া নীরদকে তাড়া করিয়া একেবারে তাহার বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। নরেন বাবু ছেলের দুখানি কাণ ধরিয়া একটি ঘরের এক কোণায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন।

তৃতীয় ব্যাপারটি—বামুনঠাকুর সুরেশের উপরে নরেন বাবুর বড় ছেলে নবীনের অত্যাচার। নবীনের ঘুম ভাঙ্গিলেই বিছানার মধ্যে তাহাকে গরম গরম এক পেয়ালা চা দিতে হইবে। সে সেই চা খাইয়া, আলস্য ত্যাগ করিয়া বিছানা হইতে উঠিবে। কিন্তু আজ আর সুরেশ তাহার বিছানার মধ্যেই চায়ের পেয়ালা দিয়া আসিতে পারে নাই। কেমন করিয়া দিবে? উনানে আগুন জ্বলিবে, তবে ত জল গরম চা তৈরী হইবে। কিন্তু সে কথা কে ভাবিয়া দেখে? নবীন ঠিক্ সময় চা পায় নাই বলিয়া সুরেশকে গালাগালি দিতে লাগিল। অন্য দিন সুরেশ এই রকম গালাগালি খাইয়া নিঃশব্দে হজম করে। আজ আর সে তাহা পারিল না। তাই সুরেশকে কহিল—"আমাকে এই রকম বিশ্রি গালাগালি দেবেন না, আমি আর সইতে পার্‌ব না।"

নবীন কহিল—"সইতে না পেরে তুমি কি কর্‌বে? আমাকে ফিরিয়ে আবার গালাগালি দিবে নাকি? এক রাত্তিরে দার্জ্জিলিঙ্গের হাওয়াতেই তোমার এতটা আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেল!"

নবীন এক ঘুসি মারিয়া সুরেশকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। কিন্তু সরলাদের বামুনঠাকুরাণী উহা দেখিতে পাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—"তুমি বামুনের গায়ে হাত তোল? তোমার সাহস ত দেখ্‌ছি কম নয়? এসেছ অন্যের বাড়ীতে, তারা যখন চা খায়, তুমিও তখন চা পাবে। তার আগে এই ছেলেটি কেমন করে তোমাকে চা খাওয়াবে?"

নবীন কহিল—"রাঁধুনী হয়ে তুমি কেন এসেছ আমার সঙ্গে কথার কাটাকাটি কর্‌তে? তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

বামুনঠাকুরাণী। আমি এখান থেকে চলে যাব, আর তুমি ছেলেটিকে ধরে মনের সাধে ঠ্যাঙ্গাবে? কেমন? এই ত তোমার মতলব?

নবীন। তোমার সাম্‌নেই যদি বামুনঠাকুরকে ধরে মারি, তা হলে তুমি কি কর্‌বে?

বামুনঠাকুরাণী। আমি কি কর্‌ব? একবার তোল ত এই ছেলের গায়ে হাত, তোমার কেমন সাহস দেখে নি। কাপুরুষ! এই অসহায় ছেলেটার উপর জুলুম কর্‌তে লজ্জা করে না?

নবীন আর মুখের কথাটি বাহির করিতেও সাহস পাইল না। সে মায়ের কাছে গিয়া সব বলিল। মা কি করিবেন? তিনি এক রাত্রেই বুঝিয়াছেন, এ তাহাদের নিজের বাসা নয়, এখানে বামুনঠাকুরাণীর যথেষ্ট সম্মান আছে।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই সকলের, চা ও জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইবার সময় উপস্থিত হইল। কিন্তু কাত্যায়নী দেবীর ছোট ছেলে-টিকে রাখে কে? পাহাড়ের উঁচু নীচু রাস্তায় সেই মোটা ছেলেটিকে কোলে লইয়া বেড়াইবার সাধ্য কাহার? তবে সেজন্য চিন্তা করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই, বামুনঠাকুরই ত আছে। নিশ্চয়ই সে আর সকাল বেলায় পাহাড়ে বেড়াইবার আশা করিতে পারে না। কাজেই ছেলেটিকে তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া কাত্যায়নী দলবল সহ বেড়াইতে বাহির হইলেন। আরে বাপরে বাপ্‌! সেই একটুখানি ছেলেরই বিক্রম কত! সে মুখে বলিতে লাগিল—"আমি মার সঙ্গে বেনাতে দাব, তোমাল কোলে দাব না!" আর হাতে বামুনঠাকুরের চুল টানিয়া, কাপড় ছিঁড়িয়া, তাহার গালে চড় মারিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

সরলা আজ আর বেড়াইতে যায় নাই, যাইতে ইচ্ছাও হয় নাই। সে দুরন্ত ছেলেটির কাছে গিয়া কহিল—"খোকা, আমি যে তোমার দিদি। আমার কোলে আস্‌বে?"

খোকা কহিল—"না, আমি মার কাছে দাব।"

সরলা হাসিয়া কহিল—“আচ্ছা, কোলে আসার অষুধ নিয়ে আসছি, দেখা যাবে তুমি আমার কোলে আস্‌বে কি না!”

সরলা একটি রেকাবে কয়েকটি রসগোল্লা লইয়া আসিয়া কহিল, “খোকা, বলত এ রেকাবে এ সব কি?”

খোকা। অসগোল্লা, আমি খাব।

সরলা। আমার কোলে না এলে রসগোল্লা খেতে পাবে না।

খোকা। তুমি ভালো, আমি তোমাল কোলে দাব।

সরলা খোকাকে রসগোল্লা খাইতে দিয়া শান্ত করিল। তাহার পরে কতকগুলি খেল্‌না ও পুতুল দেওয়ায় সে খেলাইতে লাগিল। সরলার মনে হইল, সুরেশ চা কি জলখাবার কিছুই খায় নাই। তাই সে ধীরে ধীরে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সুরেশের কাছে গিয়া কহিল—“আপনি কি চা খেয়েছেন?”

সুরেশ। আমি ত চা খাই নে।

সরলা। তা হলে কিছু জলখাবার এনে দিচ্ছি।

সুরেশ। জলখাবারও আমি খাই নে।

সরলা। এ শীতের দেশ কি না, সকালে কিছু না খেলে অসুখ [illegible]। আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি।

সুরেশ ভাবিতে লাগিল, আমার বোন সুহাসিনী যদি জলে ডুবে মারা না যেত, তবে ত আজ সে ঠিক্ এই মেয়েটির মতনই হত। তার যেমন ফুটফুটে রং, সুন্দর মুখ আর সুন্দর দুটি চোখ ছিল, এ বাড়ীর মেয়েটির গায়ের রং, আর চোখ মুখ ঠিক্ সেই রকম। আমি যদি স্বপ্ন না দেখে, সত্য সত্যই সোনার পাহাড়ের কাছে গিয়ে বাবাকে, আর তার একটু দূরে আমার বোন্‌কে দেখ্‌তে পেতুম, তা হলে আমার কোন দুঃখই থাক্‌ত না। আমার শুধুই ইচ্ছা হচ্ছে, এই সরলাকেই আমার আপনার বোন বলে মনে করি। মেয়েটি যে কি ভাল, তা আর বল্‌তে পারি নে।

সরলা একটি রূপার পাত্রে লুচি, বেগুন ভাজা আর একটু মিষ্টান্ন

আনিয়া দিল। সুরেশ উহা খাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এতই চোখের জল পড়িতে লাগিল যে, উহা আর সে ভাল করিয়া খাইতে পারিল না।

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তাহার পরে একদিন সরলা স্বপ্নে দেখিল, যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিতর হইতে একখানা সোনার রথে এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারী নামিয়া আসিতেছেন। রথখানা ধীরে ধীরে সরলার কাছেই আসিল। সেই রথের ভিতর হতেই দেবীর মতন সেই নারী নামিয়া সরলার মাথায় হাত রাখিলেন এবং আপনার অপার্থিব স্নেহ সরলার প্রাণে ঢালিয়া দিলেন। এমন সুবিমল স্নেহ সরলা আর যে কোথাও পাইয়াছে, তাহাই তাহার মনে হইল না। সরলা আনন্দে ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া সেই দেবীর অনুপম মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। দেবী কহিলেন, "আমিই তোমার মা। আর ঐ যে সুরেশ ছেলেটি, ওটি তোমারই আপনার ভাই। আহা, সে বড় দুঃখী, তাকে একটু যত্ন আদর করে এমন ত কেহ নেই; তুমি তার দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করো। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি সুখী হও।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে সরলা তাহার মাতাকে কহিল—
“মা, আমি ভারি মজার এক স্বপ্ন দেখেছি, তোমাকে তা বল্‌ব ?”

মা। বল্‌বে বই কি ?

সরলা তাহার স্বপ্নের সমস্ত কথাই মাতাকে বলিল। সে মনে করিয়াছিল, মা স্বপ্নের কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু হঠাৎ কমলাদেবীর মুখ একেবারে ম্লান হইয়া পড়িল। সরলা কহিল—“সে কি মা, তোমার মুখ বিষণ্ণ হল কেন ? তোমার মতন এমন ভাল মা আর কার আছে ? আমি তোমায় ছেড়ে স্বর্গের দেবীকেও মা বল্‌তে চাই নে। একটা মিথ্যা স্বপ্ন দেখ্‌লামই বা, তাতে কি হয়েছে ?”

কমলা দেবী আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন—“সুরেশের কষ্ট দেখে তোমার বুঝি বড়ই দুঃখ হয় ?”

সরলা। মা, সেইছেলেটির অবস্থা দেখে তোমার কি দুঃখ হয় না ?

মা। আমার ত ছেলেটির মুখের পানে চাইলেই ব্যথায় বুক ভরে উঠে।

সরলা। তাই বুঝি তাকে সব কাপড় জামা কিনে দিয়েছ ?

মা। কিনে না দিলে সে কি তার ছেঁড়া কাপড় পরে আর ময়লা ছিটের জামা গায়ে দিয়ে দার্জ্জিলিঙ্গের শীতে টিকে থাকৃতে পার ত ?

সরলা। আচ্ছা মা, বাবা কি সহর থেকে একটি ভাল বামুন জুটিয়ে দিয়ে কাকীমার হাত থেকে এই সুরেশকে মুক্ত কর্‌তে পারেন না ? তা পার্‌লে সুরেশ হয় ত এখানকার ছেলেদের বোর্ডিংএ থেকে স্কুলে পড়্‌তে পারেন। বাবা কত গরীব ছেলেকেই পড়ার খরচ দিচ্ছেন, সুরেশের খরচটা না হয় তিনিই দিতেন।

মা। তা তুমিই তোমার বাবাকে সব কথা কেন বল না। আচ্ছা থাক্‌, আমিই সব বল্‌ব।

সেই দিনই কমলা দেবী সরলার বাবাকে কন্যার স্বপ্নের কথা এবং আর সকল কথাই বলিয়া, কহিলেন, “আমাদের বামুনঠাকুরাণী বলেন, সুরেশ ছেলেটির গায়ের রং মুখের গড়ন ঠিক যেন সরলার মতন। আমার ত সরলার স্বপ্নের কথাই সত্য বলে মনে হয়। হয় ত যথার্থই এই ছেলেটি সরলার আপনার ভাই। ভাই বলেই তাকে দেখে অবধি তার উপরে সরলার কেমন একটা স্বাভাবিক স্নেহ জন্মেছে।”

নগেন্দ্র বাবু গম্ভীর ভাবে একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “সে দিন সুরেশকে আমি আমার ঘরে ডেকে নিয়ে তার জীবনের সব কথা জানতে চেয়েছিলুম। সুরেশ বল্লে, তার বাবা ডিব্রুগড়ের সিভিল সার্জ্জন অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব ছিলেন। একদিন ঝড়ের রেতে ব্রহ্মপুত্র নদীতে তাদের নৌকা ডুবি হয়। তার পরে আর তার বাবা, মা ও ছোট বোনের কোনই খবর পাওয়া যায় নি। কিন্তু যে তারিখে সুরেশদের নৌকা ডুবে যায়, তারই এক সপ্তাহ পরে আমরা আসামের পরশুরাম তীর্থে গিয়েছিলুম। তীর্থ হতে ফিরে আসার সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর জেলেদের নৌকায় সরলাকে দেখতে পেয়েছিলুম। জেলেরা ঝড়ের রাতে সরলাকে নদীর তীরে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল। তারা অনেক চেষ্টা করেই সরলার জীবন রক্ষা করেছিল। তোমার হয় ত মনে আছে, আমি যে দিন জেলেদের টাকা দিয়ে সরলাকে নিয়ে এলুম, সরলা সে দিন আধ আধ স্বরে বলেছিল, আমার নাম “ছুহাসিনী”, তার পরেই ত আমরা তার সরলা নাম রেখেছিলুম। সুরেশ বলছে, সুহাসিনী তার ছোট বোনেরই নাম। তাই ত আমারও মনে হচ্ছে, হয় ত এই সরলা সুরেশেরই আপনার মায়ের পেটের বোন।”

কমলা দেবী। মাগো! তা হলে কি হবে? সুরেশ কি সব জানতে পেরে সরলাকে আমাদের বাড়ী হতে নিয়ে যাবে?

নগেন্দ্র। নিয়ে যাবে কেন? সরলাকে আমরা যেমন আমাদের

মেয়ের মতন রেখেছি, তেম্নি সুরেশকে ছেলের মতন আমাদের কাছেই রেখে লেখাপড়া শেখাব'। তা হলে দুজনেই আমাদের আপনার হয়ে যাবে।

এইবার সরলার জীবনের একটি রহস্যকথা প্রকাশ হইয়া পড়িল; সে যে নগেন্দ্রনাথ ও কমলাদেবীর মেয়ে নয়, তাঁহাদের পালিতা কন্যা, তাঁহারা যে সরলাকে আসামের এক জেলের কাছে পাইয়া মানুষ করিয়াছেন, তাহা এতদিন পরে বুঝিতে পারিলাম। সরলা যখন এই পরিবারে আসিয়াছিল, তখন তাহার বয়স খুবই কম ছিল কি না, তাই সে জানে নগেন্দ্রনাথ এবং কমলাদেবী তাহার আপনারই পিতা ও মাতা। কিন্তু সরলার ঝাকীমা কাত্যায়নী এবং তাদের বড় ছেলেরা সরলার সকল কথাই জানিত। সেই জন্যই সরলার উপরে তাহাদের ভয়ানক রাগ এবং কুটিল দৃষ্টি। তাহারা মনে করে, এ উৎপাত কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া নগেনবাবুর সমস্ত হৃদয় খানি জুড়িয়া বসিয়াছে? তাঁহার বাড়ী, ঘর, তাঁহার চা-বাগান, তাঁহার বিস্তর টাকা এ সকল হইতেই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তিনি ঐ মেয়েটাকেই লিখিয়া দিবেন। এই জন্যই ত কাত্যায়নী স্বয়ং এবং তার ছেলেরা সরলার পানে সুনজরে চাহিতেও পারে না; মুখে দুটি মিষ্টি কথা বলিয়া তাহাকে যে একটু স্নেহ দিবে, তাহাও দিতে সমর্থ হয় না।

সরলার পিতা নগেন্দ্রনাথ একদিন তাঁহার ভাই নরেন্দ্রনাথকে নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার বামুনঠাকুরটির সব কথই আমি শুনেছি। এক সময় তার বাবার কত চাকর বামুন ছিল, আর আজ সে চাকরেরও অধম হয়ে তোমাদের কাছে বাস কর্‌ছে। বাক্যের জ্বালা, ক্ষুধার জ্বালা এবং অপমান—এ সকলই তোমাদের কাছে সহ্য কর্‌তে হয়। সেই জন্যই ছেলেটিকে আমি আমার কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাতে চাই। এ বিষয়ে তোমার কি কিছু আপত্তি আছে?"

নরেন বাবু কহিলেন, "সুরেশকে তুমি যদি রাখ, তা হলে ওর হাড়

জুড়ায়। ছেলেটিকে আজই আমি তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি; অসহায় ছেলেটি তোমার কাছে থেকে সুখী হোক।"

ইহার পরে একদিন নগেন্দ্রনাথ সুরেশকে সঙ্গে লইয়া সরলার কাছে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "সরলা, সুরেশ যে খুব ভাল সংস্কৃত জানে; আজ থেকে সুরেশই তোমাকে সংস্কৃত পড়াবে। সুরেশ তোমার শিক্ষক হলেও তাকে কিন্তু মাষ্টার মশাই বলে ডেক না, এ যে এখন আমাদের ঘরেরই ছেলে হ'ল, একে দাদা বলেই ডেক। সুরেশও তোমাকে আপনার ছোট বোন বলেই মনে করবে।"

নগেন্দ্র বাবু সুরেশকে কহিলেন, "তুমি দার্জ্জিলিঙ্গের হয় ত কিছুই দেখ্‌তে পাও নি। এস, আজ তোমাকে বোটানিকেল গার্ডেনে নিয়ে যাই।"

সুরেশের যথেষ্ট সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল। সে তরুলতা ও ফুল বড়ই ভালবাসিত। তাই সে বোটানিকেল গার্ডেনে যখন একটি রমণীয় পুষ্পোদ্যান ও তরুকুঞ্জের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তখন নানা জাতীয় পুষ্পের ও নানা রকম বৃক্ষের সৌন্দর্য্যে তাহার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। নানা রঙে রঞ্জিত এক একটি ফুলের পাপড়ি দেখিয়া সুরেশের মনে হইল, যেন স্বয়ং ঈশ্বর ফুলের উপরে রং ঢালিয়া রাখিয়াছেন। সুরেশ সে দিন আকাশে নানা রকম মেঘের খেলা, পাহাড়ে নানারূপ তরুলতার শোভা এবং উদ্যানের বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নূতন রকমের পুষ্প দেখিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিল।

এই সময়ে দার্জ্জিলিঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি আসিয়াছিলেন। সেই জন্য সেখানে একদিন বিস্তর সৈন্য কৃত্রিম-যুদ্ধ দেখাইয়াছিল। যুদ্ধ হইবার আগেই লোকেরা শুনিয়াছিল, যাহারা যুদ্ধের জায়গায় গিয়া কখনো লড়াই দেখে নাই, তাহাদের এইকৃত্রিম যুদ্ধের মতন আশ্চর্য্য দেখিবার বিষয় আর কিছু নাই বলিলেই হয়। ইংরাজ সৈন্যরাই দুই পক্ষের দুই দল সৈন্য হইয়া কামান বন্দুক তলোয়ার লইয়া যখন যুদ্ধ করে, তখন তাহা দেখিলে একেবারে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এই কথা শুনিয়া কত

লোকেরই সেই কৃত্রিম যুদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। নবীন ত যুদ্ধ দেখিবার জন্য ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেমন করিয়া যুদ্ধ দেখিবে? লাট সাহেব যাহাদের নামে এই যুদ্ধ দেখার কার্ড পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাই যুদ্ধ দেখিতে পারিয়াছিল। নগেন্দ্র বাবুর নামে তিনখানা কার্ড আসিয়াছিল। তিনি সরলা ও সুরেশকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। তাই নবীন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। পাঁচ দিন আগে যে বামুনঠাকুরের দুটি কাণ মলিয়া দিলেও কিছু বলিবার কেহ ছিল না, আজ সে তারই জেঠামহাশয়ের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল, জেঠামহাশয় তাহাকে উত্তম পোষাক পরাইয়া যুদ্ধ দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া গেলেন? শুধু কি তাই, বামুনঠাকুরাণী ঠাট্টা করিবার মতলবে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "কি গো নবীন বাবু, তুমি কত বড় হাকিমের ছেলে, লড়াই দেখ্‌বার জন্য তোমার নামে লাট সাহেব একখানা নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠালেন না?"

নবীন রাগে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সে যদি আজ কোন রকম মন্ত্রের শক্তিতে বনের বাঘ হইতে পারিত, তাহা হইলে সুরেশের হাড় মাংস ছিঁড়িয়া খাইত। হায়, হায়, তাহার বাঘ হইবারও উপায় নাই, সুরেশকে সে যে কিছু বলিবে তাহার সে পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র বাবু এখন প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে আপনার সুন্দর একটি ঘরে সুরেশ এবং সরলাকে লইয়া বসেন। প্রথমে সরলা একটি গান করে, তার পরে নগেন বাবু ঈশ্বরের একটি স্তোত্র পাঠ করেন। স্তোত্র পাঠের পরে তিনি সুমিষ্ট ভাষায় নানা দেশের ধার্ম্মিক ও মহৎ লোকদিগের জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেন। শুনিতে শুনিতে সুরেশের মন পুলকে ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠে। সে মনে মনে বলিতে থাকে, "আমি খুব দুঃখ পাইয়াছি বটে, কিন্তু যদি লেখাপড়া শিখে খুব ভাল হতে পারি, তবে আর আমার কোন্ সুখের অভাব থাক্‌বে?"

এক দিন নগেন্দ্র বাবু আর সুরেশ একটি ঘরে বসিয়া কথা

বলিতেছিলেন; এমন সময় সরলা, হাতে একখানি ছবি ও একটু কাগজ লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "কি সরলা, কে প্রাইজ পেল ?"

সরলা। আমি পেয়েছি।

সরলা মেমদের কণ্‌ভেণ্টে অর্থাৎ আশ্রমস্থ স্কুলে পড়ে। তাহাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী একদিন কয়েকটি মেয়েকে বলিয়াছিলেন, "সে দিন হাঙ্গেরীর রাজকন্যা তাপসী এলিজাবেথের ছবি দেখায়ে তাঁর জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী তোমাদের বলেছি। তিনি যখন ছোট মেয়ে, তখনই সবচেয়ে ঈশ্বরকে বেশী ভালবাস্‌তেন। এই রাজকুমারীই জার্ম্মণীর রাণী হয়ে দুর্ভিক্ষের সময় রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ দুঃখীদের বিতরণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী রাজা লুই জেরুজিলামের যুদ্ধে যাবার সময় জাহাজেই মারা গেলেন। তখন বিধবা রাণীর অল্প বয়স। অথচ সেই বয়সেই তিনি সন্ন্যাসিনীর মতন নির্জ্জনে বাস করে ঈশ্বরের উপাসনা আর কুষ্ঠরোগীদের শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কই ? এমন রাণীর কথা আর ত কোথাও শুন্‌তে পাইনে। তোমাদের ক্লাশের যে মেয়ে এই রাণীর ছবি দেখে সব চেয়ে একটি ভাল ছবি আঁক্‌তে আর তাঁর বিষয়ে ছোট একটি কবিতা রচনা কর্‌তে পারবে, তাকে আমি পঁচিশ টাকা দামের বই প্রাইজ দেব।"

সরলা এই প্রাইজটিই পাইয়াছে। নগেন বাবু খুসী হইয়া সরলার আঁকা ছবিটি দেখিলেন এবং কহিলেন, "বেশ মিষ্টি করে তোমার কবিতাটি পড় ত, শুনি।"

সরলা পড়িতে লাগিল—

"হে রাণী, কিরূপে দিয়ে সবি আপনার,
তুমি হলে ঈশ্বরের, ঈশ্বর তোমার ?
সুখেরে করিলে তুচ্ছ কোন্ সুখ পেয়ে ?
চাহিলে দুঃখীর পানে, কার পানে চেয়ে ?

ভালবেসে ভালবাসা পেলে দেবতার,
জননী হইলে তুমি কত অনাথার।
দুই হাতে ধনরত্ন করিয়াছ দান,
জগতে তুমিই রাণী তোমার সমান।"

নগেন বাবু। বেশ ত সরলা, কবিতাটি ত মন্দ হয় নাই।

কবিতাটি শুনিয়া সুরেশও সুখী হইল। এক রকম সুখেই তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু সুরেশের এই সুখ কাত্যায়নী দেবী সহিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখ টাটাইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "বামুনঠাকুর যে হঠাৎ নবাব হয়ে পড়্‌লো।"

শুধু কি তাই? কাত্যায়নী শুধুই সুরেশকে জব্দ করিবার একটা মতলবে হঠাৎ দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিয়া বক্সারে যাইবার দিন ঠিক করিলেন। যাইবার দিন তিনি সুরেশকে সঙ্গে লইয়া যাইবেনই। তিনি অনেক দিন ধরিয়া সুরেশকে রান্নাবান্না এবং না শিখাইয়াছেন কি? তুমি বাড়ীতে দুজন সাহেব-সুবাকে নিমন্ত্রণ করিবে? তা কর না কেন, সুরেশ প্রথম শ্রেণীর বাবুর্চ্চির মতন খানা তৈরী করিয়া সাহেবকে খাওয়াইবে। তার পরে লুচি বল পোলাও বল, পিঠে পায়েস যা বল না কেন, একবার মুখের কথা বাহির করিলে সে ঠিক ফরমাস মতন জিনিষগুলি তৈরী করিবে। এখন কি না কাত্যায়নী সেই সুরেশকেই পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটা মেয়ের মাষ্টার করিয়া রাখিয়া যাইবেন? তা তোমরা দশজনে তাঁর নিন্দা করিতে হয় কর, ও রকম নিন্দা তাঁর ঢের শুনা আছে, তিনি কিছুতেই সুরেশকে দার্জ্জিলিং রাখিয়া যাইবেন না। যখন বক্সারে তাঁর বাক্যের বাণ খেয়ে রাঁড়েঠাকুর পলাইয়া গিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইবে, তখন কি তিনি এই বয়সে তাঁহার প্রকাণ্ড শরীরটি লইয়া উনানের কাছে কাঠ ঠেলিতে যাইবেন? তাহা তিনি পারিবেন না।

নরেন বাবু নিরুপায় হইয়া দাদাকে কহিলেন, "আমাকে মাপ কর; সুরেশকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েও আবার ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে। নইলে এখনো আমার ঘরে যে শান্তিটুকু আছে, সেটুকুও আর থাক্‌বে না, আমায় ঘর ছেড়ে পালাতে হবে।"

এ কথার পরে নগেন বাবু আর কেমন করিয়াই বা সুরেশকে আপনার বাড়ীতে রাখিতে পারেন? তিনি অতিশয় দুঃখের সহিত সুরেশকে নরেন বাবুর সহিত বক্সারে যাইতেই অনুরোধ করিলেন। তাঁহার মহৎ হৃদয় যতই দয়ায় পূর্ণ হোক না কেন, বুঝি বা সেই হৃদয়ের এক কোণে একটু স্বার্থ, একটু ভয় একটু উদ্দেশ্য লুকানো ছিল। সেজন্য তিনি খুব শান্ত হইয়া সুরেশকে আপনার কাছে রাখিতে পারিলেন না।

সুরেশ যে দিন দার্জ্জিলিং হইতে নরেন বাবুর সঙ্গে চলিয়া গেল, সে দিন তাহার মনের ভিতর যে কি রকম হইতেছিল, সে কথা তাহার অন্তর্য্যামী ঈশ্বর ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিবে? সে দিন কমলা দেবীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সরলা নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইল।

সুরেশ ত নরেন বাবুদের সঙ্গে আবার তার সেই পুরাণো জায়গা বক্সারে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই এক ঘটনা ঘটিল। এখন সেই ঘটনার কথাই লিখিতেছি।

নরেন বাবু একবার লাট সাহেবের সঙ্গে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা আস্তে আস্তে এক ভীষণ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার পরে, লাট সাহেব বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি একটু অসাবধান হওয়ায়, তাঁহার দুই দিক হইতে প্রকাণ্ড দুই বাঘ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন নরেন বাবু আশ্চর্য্য কৌশলে গুলি করিয়া একটা বাঘ মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতেই লাট সাহেবের প্রাণরক্ষা হইল। সেই জন্য তিনি নরেন বাবুকে অনেক টাকা দামের একটি সাদা ঘোড়া উপহার দিয়াছিলেন। সেটি বিলাতের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া; খুব ছুটিতে পারিত। নরেন বাবু ঘোড়াটিকে

অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। তিনি নিজেই ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়িতেন, তাহা ছাড়া আর কাহাকেও চড়িতে দিতেন না।

কিন্তু নবীনের ঘোড়দৌড়ের বাতিক ছিল। সে গোপনে ঐ ঘোড়া লইয়া সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া ঘোড়দৌড় খেলিত। নরেন বাবু তাহার কোনই খবর রাখিতেন না। অবশেষে একদিন নরেন বাবু মফঃস্বলে যাইবার জন্য বেলা তিনটার সময় আপীশ হইতে বাসায় আসিলেন। তিনি বাসায় আসিয়া আস্তাবলে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘোড়া নাই। প্রথমে তিনি বাসার ভিতরে কাত্যায়নী দেবীকে গিয়া কহিলেন, "আমার ঘোড়া কে নিয়ে গেল?"

কাত্যায়নী দেবী রাগ করিয়া কহিলেন, "আমি কি তোমার ঘোড়ার সইস? আমার কাছে ঘোড়ার খবর জান্‌তে এসেছ কেন?"

নরেন বাবু স্থরেশকে কহিলেন, "স্থরেশ, তুমি বল ত, কে আমার ঘোড়া নিয়ে গিয়েছে?"

স্থরেশ বোবার মতন চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে নরেন বাবুর ধমক খাইয়া বাধ্য হইয়াই সে কহিল, "নবীন বাবু ঘোড়া নিয়ে ঘোড়দৌড় খেল্‌তে গিয়েছেন।"

নরেন বাবু। সে কি শুধু আজই ঘোড়দৌড় খেল্‌তে গিয়েছে, না প্রায়ই আমার ঘোড়া নিয়ে ঘোড়দৌড় খেল্‌তে যায়?

স্থরেশ। তিনি যে দশ বার দিন আপনার ঘোড়া নিয়ে ঘোড়দৌড় খেল্‌ত গিয়েছেন, সেই খবরই আমি জানি।

নরেন বাবু আপীশের পোষাক পরিয়াই বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলেন। বেলা পাঁচটার সময় যেমন নবীনের ঘোড়া লইয়া বাসায় আসা, অমনি নরেন বাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার কাছে গেলেন। কাছে গিয়াই তিনি ঘোড়ার চাবুক লইয়া শপাং শপাং করিয়া নবীনকে মারিতে লাগিলেন। এদিকে কাত্যায়নী দেবী চীৎকার করিয়া বলিতে

লাগিলেন, "ওগো কে কোথায় আছ, শীগ্‌গির এস, দস্যু যে আমার ছেলেকে মেরে খুন কর্‌লে।"

কাত্যায়নীর চিৎকারে নরেন বাবুর বাসায় চারিদিকে লোক আসিয়া জড় হইল। তখন নরেন বাবু বৈঠকখানার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

সে দিন ত কোন রকমে কাটিয়া গেল। তাহার পরের দিনই সুরেশের বিপদ ঘনাইয়া আসিল। সে দিন নবীন ঘোড়ার চাবুক হাতে করিয়া সুরেশের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল। সুরেশই যে ঘোড়দৌড়ের সকল কথা তাহার পিতাকে বলিয়াছে, তাহা সে মাতার কাছেই শুনিয়াছিল। তাই তাহার প্রতিজ্ঞা, আজ সে এক দুই করিয়া গুণিয়া গুণিয়া বামুনঠাকুরকে পঁচিশ ঘা চাবুক লাগাইবে। প্রথমেই সে কদর্য্য ভাষায় সুরেশের বাপ মা তুলিয়া গালাগালি দিতে লাগিল। কিছুদিন আগে হইলে, সুরেশ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সমস্ত গালাগালি হজম করিয়া ফেলিত। কিন্তু দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসার পরে আর সে গালাগালি হজম করিতে পারিতেছে না। সুরেশ নবীনকে কহিল, "যদি আপনার বাবার কাছে সত্য কথা বলে অপরাধ করেই থাকি, তা হলে আমাকে গালাগালি দিন; কিন্তু আমার নির্দ্দোষ পিতামাতার উল্লেখ করে ইতর ভাষায় গালাগালি দিবেন না।"

নবীন। গালাগালি দিলে কি কর্‌বে? তুমিও আমাকে বাপ মা তুলে গালাগালি দিবে নাকি?

সুরেশ। আমার মন তত ছোট নয়। তা ছাড়া আমার বাপ মা আমাকে এমন শিক্ষা দেন নাই যে, অপরের বাপ মা তুলে ইতর ভাষায় গালাগালি দেব। আপনি আবার আমার পিতামাতার কথা বলে মুখ থেকে কদর্য্য ভাষা বের কর্‌লে, আমি এই হাত দিয়েই আপনার মুখ বন্ধ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

নবীন। বটে! দার্জ্জিলিং গিয়ে বোবার মুখে ভাষা ফুটেছে? বুকের পাটা বেড়েছে? রস, তোমাকে দেখাচ্ছি—

নবীন সুরেশের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহার গায়ে এক ঘা চাবুক লাগাইল। সুরেশ নবীনের হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া কহিল, "হা হতভাগা, তুমি জান না যে, আমি পাহাড়ে থাকার সময় পাহাড়ীদের কাছে কুস্তি শিখে আমার হাত পা লোহার মত শক্ত করেছি। এখানে তোমাকে রক্ষা করার মতন পুরুষ মানুষ কেউ নেই; যদি এখনি গলা চেপে ধরে তোমাকে মেরে ফেলি, কে আমাকে বাধা দিবে, বল ত? তোমাকে প্রাণে মারব না। কিন্তু যে মুখে জঘন্য ভাষায় মানুষকে গালাগালি দাও, সে মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে আমি চলে যাব।"

ভয়ে নবীনের মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না। কিন্তু সুরেশ বজ্রমুষ্টিতে নবীনের মুখের উপরে এক ঘুষি মারিল। যথার্থই নবীনের একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, বন্ বন্ করিয়া তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সুরেশ তৎক্ষণাৎ বাড়ীর বাহির হইয়া এক গলিতে প্রবেশ করিল। সে ঘুরিতে ঘুরিতে আগের সেই ভিখারিণী বালিকার বাড়ীর সাম্নে গিয়া পৌছিল। বালিকা গাহিতেছিল—

"কত বড় এই ধরণী", স্নেহভরা কোলে তার,
খুঁজ্লে পরে মিল্বে না কি আশ্রয় একটু অভাগার?"

বালিকা অনেক দিন পরে সুরেশকে দেখিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধিমতী মেয়েটি সুরেশের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, বিপন্ন। সুরেশ, তাহার কাছে আপনার সকল কথাই বলিল। শুনিয়া বালিকা কহিল, "আপনি এখন ত আমাদের বাড়ীতেই আসুন। পরে ভেবে চিন্তে আর কোথাও চলে যাবেন। আমার বাবার কাছে থাক্লে কেউ আপনার কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।"

বালিকার দুর্জ্জয় সাহস ও আশ্চর্য্য বুদ্ধির কথা সুরেশ ত ভাল করিয়াই

জানিত, তাই সে ভিখারিণীর পিতার কাছেই গেল।

নবীনের জ্ঞান হওয়ার পরে সে যখন শুনিল, বামুনঠাকুর ভিখারিণী বালিকার বাড়ীতেই আছে, তখন সে কয়েক জন ভোজপুরী গুণ্ডা লইয়া, বামুনঠাকুরকে মারিবার জন্য সেই মেয়েটির বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার পিতা প্রথম বয়সে পল্টনে সিপাহির কাজ করিত। একবার যুদ্ধে খুব সাহস দেখাইয়াছিল বলিয়া সে বেশ ভাল একখানা তলোয়ার উপহার পাইয়াছিল। বালিকা বাপের সেই তলোয়ার হাতে লইয়া দ্বারের কাছে ভোজপুরী গুণ্ডার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। সে কহিল, "কোন্ গুণ্ডা আমাদের বাড়ীতে ঢুক্‌বে, একবার সাহস করে ঢুকুক্ ত দেখি, আমি এই তলোয়ারে তার মাথা না কেটে কি আস্ত রাখ্‌ব? তেমন মেয়েই আমি নই।"

ঝড়ে যেমন লতা কাঁপে ভিখারিণী রাগে তেমনি কাঁপিতেছিল। গুণ্ডারা তাহাদের জীবনে কত বলবান পুরুষকে মুহূর্ত্তের মধ্যে মারিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু আজ জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকার মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহাদের মনে হইল, যেন কোন্ দেবী তাহাদের সংহার করিবার জন্য দেবলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে। গুণ্ডারা নবীনকে লইয়া সরিয়া পড়িল।

সুরেশ ভিখারিণীর গানের কথা ভাবিতে লাগিল। খুঁজিলে পরে প্রকাণ্ড ধরণীর কোথাও কি আমার একটুখানি আশ্রয় মিলিবে না— নিশ্চই মিলিবে। আমি কেন অন্যের অধীন হইয়া থাকি? আমি আজ রাত্রেই ঈশ্বরের নাম করিয়া এই বৃহৎ জগতে বাহির হইয়া পড়িব। কোথাও আশ্রয় একটু পাওয়া যাইবেই।

গভীর রাত্রে সুরেশ ভিখারিণীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, কোথায় যে অগণ্য অসংখ্য লোকের সঙ্গে মিশিয়া পড়িল, নরেন বাবু বিস্তর সন্ধান করিয়াও আর কোনই খোঁজ খবর পাইলেন না।



দুইটা বনগরু করুণাময় বাবুর একজন সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছে

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুরেশদের নৌকা ডুবির পরে, তাহার মা ও বোনদের কি হইল, এখন সেই বিষয়েই কিছু লিখিব। সুরেশের মা মনোরমা দেবী খুব সাঁতার জানিতেন। নৌকাডুবির সময়ে তিনি তাঁহার কোলের মেয়ে নির্ম্মলাকে একহাতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে সাঁতার দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুমুখ দিয়াই খুব বড় একখানা কাঠ ভাসিয়া যাইতেছিল, তিনি সেই কাঠখানা ধরিলেন। উহাতে তাঁহার খুব সুবিধা হইল। জলের ঢেউ তাঁহাকে কাঠের সঙ্গে ঠেলিয়া ঠেলিয়া এক পাহাড়ের কাছে লইয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে লইয়া পাহাড়ের উপরে গিয়া উঠিলেন। তখন ভয়ানক ঝড় হইতেছে, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কোথাও কিছুই দেখা যায় না। কোথায় বা তাঁহার স্বামী, কোথায় বা তাঁহার আর দুই ছেলে মেয়ে, কে সে কথার জবাব দিবে?

তাহার পরে ঝড় থামিয়া গেল, রাত্রি প্রভাত হইল; মনোরমা দেবী চাহিয়া দেখিলেন, চারিদিকে শুধু জল থই থই করিতেছে, তাহারই মাঝখানে তিনি মেয়েটিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। মেয়েটি অজ্ঞানের মতনই তাঁহার কোলে পড়িয়া ছিল, এখন জ্ঞান হওয়ায় সে বলিতে লাগিল, ও মা, বড় শীত, কাপড় জামা যে সবই ভিজে।"

মেয়েটি অর একটু পরে কহিল, "মা, বাবা কোথায়? আমার দাদা ও দিদি কোথায়?"

মনোরমা দেবী কাঁদিতেছিলেন। মেয়েটিও মায়ের মুখের পানে চাহিয়া লাগিল। তাহার পরে একদল অসভ্য মনোরমা দেবীকে দেখিতে ইল, তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। অসভ্য মানুষগুলি মনে রল, নিশ্চয় জলদেবী আমাদের উপরে দয়া করিয়া দেখা দিয়াছেন।

তাহারা গ্রামের বিস্তর পুরুষ ও মেয়ের কাছে খবর পাঠাইল। তাহারা জলদেবীকে দেখিতে আসিল। দেবীকে দেখিয়া অনেকেই মাদল বাজাইয়া নাচ গান আরম্ভ করিল। শুধু তাহাই নহে; কেহ কেহ মনোরমা দেবীর সম্মুখে শূয়র বলি দিতে লাগিল। ভয়ে মনোরমা দেবী কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার মেয়েটি মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া রহিল।

এই সময়ে অসভ্যদের একজন দোভাষী সেখানে আসিল। তার অসভ্যদের মধ্যে জন্ম হইলেও সে সাহেব ও বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশিয়া একটু সভ্য হইয়াছে। সে একটু বাংলা, একটু ইংরাজী, একটু আসামের ভাষা বলিতে শিখিয়াছে। দরকার হইলে সে দোভাষীর কাজ করে, অর্থাৎ একের কথা অপরকে বুঝাইয়া দেয়। এই লোকটি মনোরমা দেবীর কাছে গিয়া বাংলা ভাষায় তাঁহার সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল। মনোরমা দেবী নিজের বিপদের কথা দোভাষীকে বুঝাইয়া বলিলেন। দোভাষী আবার তাঁহার কথা অসভ্যদের বুঝাইয়া দিল। অসভ্যেরা সভ্যতার আলো পায় নাই বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও কোমলতার যে অভাব ছিল, তাহা নয়। অসভ্যদের দলপতি, তখনই সেই দেশের এক রকম পাল্কী লইয়া আসিতে তাহার লোকদিগকে হুকুম করিল। সেই পাল্কীতে মনোরমা দেবী অসভ্যদের গ্রামে যাইবেন। গ্রামখানি একটি উঁচু পাহাড়ের অতি উচ্চ শিখরে। অসভ্যেরা সেখানে তাহাদের দেশের অসভ্য রাজার রাজত্বে বাস করে। মনোরমা দেবী নিরুপায় হইয়া কন্যাটিকে লইয়া পাহাড়ের উপরে বাস করিতে সম্মত হইলেন। ছোট একটি পাথরের ঘর তাঁহার জন্য ঠিক্ হইল।

মনোরমা দেবী অসভ্যদিগকে নানা জায়গায় পাঠাইয়া স্বামী পুত্র ও কন্যার অনেক খোঁজ করিলেন, কোথাও তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই তিনি মনের দুঃখে আর ডিব্রুগড়ও ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন না, পাহাড়ীদের দেশেই কন্যাটিকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পাহাড়ী-

দের মেয়ে পুরুষ সকলেই তাঁহাকে দেবীর মতন মান্য করিতে লাগিল। তিনি স্বামীর কাছে বই পড়িয়া একটু ডাক্তারি শিখিয়াছিলেন। এখন পাহাড়ীদের অসুখের সময় অষুধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাহাড়ে বাস করিবার তিন মাস পরেই মনোরমা দেবীর আর একটি কন্যা জন্মিল। তাহার নাম হইল সরযূ। পাহাড়ীরা চাউল, মাংস, ফল ও দুধ আনিয়া দিত, মনোরমা দেবী উহাই রাঁধিয়া নিজে খাইতেন এবং দুটি মেয়েকে খাওয়াইতেন। পাহাড়ের সকল পুরুষ মেয়ে, এমন কি রাজা ও রাণী তাঁহাকে দেবীর মতনই মনে করিয়া যত্ন আদর করিতেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সুখী হইতে পারিলেন না; অনেক সময়েই ছেলের কথা, একটি মেয়ের কথা এবং স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেন। তাঁহার মেয়ে নির্ম্মলা বড়ই বুদ্ধিমতী; সে যতই বড় হইতে লাগিল, ততই মাকে শান্ত করিবার জন্য নানা রকম চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নির্ম্মলা পাহাড়ীদের কাছে তীর ধনুকের যুদ্ধ শিখিত। এক এক দিন সে পুরুষের মতন পোষাক পরিয়া তীর ধনুক লইয়া মায়ের কাছে আসিত; তাহার পরে মাকে বলিত—

"মা, চেয়ে দেখ, আজ আমি তোমার ছেলে হয়েছি। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? ঠিক আমার দাদার মতন? আচ্ছা মা, তুমি মনে কর না কেন আমিই তোমার বড় ছেলে সুরেশ। আমি নিশ্চয়ই খুব লেখাপড়া শিখ্‌ব, তার পরে কলিকাতায় গিয়ে মেয়ে স্কুলে চাকুরি নেব, টাকা উপার্জ্জন করে তোমাকে এবং আমার ছোট বোনকে সুখী কর্‌ব।"

মা মেয়েকে বুকের ভিতরে নিয়া মনের স্নেহ তাহার প্রাণে ঢালিয়া দিতেন। মায়ের স্নেহ পাইয়া নির্ম্মলা তাহাদের সকল দুঃখের কথা ভুলিয়া যাইত। কিন্তু হায়, মনোরমা দেবী তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা ভুলিয়া যাওয়া ত দূরের কথা, তিনি দিনরাত ছেলে মেয়ে ও স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাগলিনীর মত হইলেন। তাঁহার মাথা এমন খারাপ হইয়া গেল

যে, একদিন চীৎকার করিয়া নির্ম্মলাকে বলিতেন, "নির্ম্মলা, ঐ চেয়ে দেখ, তোমার দাদা ঘোড়ায় চড়ে কামান বন্দুক নিয়ে পাহাড়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে। এস, এস, তার কাছে ছুটে গিয়ে বলি, পাহাড়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না, ওরা যে আমাদের আপনার লোক, ওরা যে আমাদের বড় ভালবাসে। নির্ম্মলা, ঐ যে তোমার দাদা যুদ্ধ আরম্ভ করল, দেখছ না, ঐ যে পাহাড়ীদের গায়ে বন্দুক ছুঁড়ছে? তুমি তোমার দাদাকে বারণ করো না।"

আবার কিছুক্ষণ পরে মনোরমা দেবী বলিতেন, "ঐ দেখ, তোমার দিদি সোনার রথে চড়ে স্বর্গে তোমার বাবার কাছে চলে যাচ্ছে। মারে, তুই আমায় এইখানে ফেলে তোর বাবার কাছে চলে যাস্‌নে; আমি যে তোর বড় দুঃখিনী মা; তোকে না দেখে কেমন করে দিন কাটাব?"

নির্ম্মলা আর কি করিবে? সে তার মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া শুধুই কাঁদিত। কিন্তু ইহার পরেই বিপদ ঘনাইয়া আসিল। একদিন রাত্রে নির্ম্মলা ও তাহার ছোট বোনটি ঘুমাইয়া আছে, এমন সময় মনোরমা দেবী ঘরের বাহির হইলেন। অবশেষে "ঐ যে আমার বড় ছেলে ও বড় মেয়ে আমায় ফেলে পালিয়ে যায়; যাই—যাই—আমিও ওদের সঙ্গে চলে যাই" —বলিয়াই তিনি ছুটিয়া চলিলেন। যখন রাত্রি প্রভাত হইল, তখন মাকে না দেখিয়া নির্ম্মলা ও সরযূর দুঃখের আর সীমা রহিল না; দুটি বোন মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ও মা, তুমি কোথায়? ফিরে এস, একবার আমাদের কাছে ফিরে এস, তুমি ছাড়া আর যে আমাদের কেউ নেই।"

পাহাড়ের লোকেরা কতই খুঁজিল, কিন্তু কোথাও মনোরমা দেবীকে পাওয়া গেল না। তখন বালিকা নির্ম্মলাই মায়ের মতন হইয়া ছোট বোন সরযূকে মানুষ করিতে লাগিল। সে নিজে রান্না করিত, তাহাই দুই বোন খাইত। রাত্রি হইলে নির্ম্মলাই, বোনটিকে বুকের কাছে রাখিয়া শুইয়া থাকিত।

এই রকম করিয়া ত দুটি বোনের কিছুদিন কাটিয়া গেল। তাহার পরে পাহাড়ে এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। পাহাড়ের উপরে পাহাড়ীদের রাজ্য, কিন্তু নীচে ইংরাজের রাজ্য। ইংরাজ-রাজ্যে বড় বড় গাছ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তবুও নীচে ইংরাজের একদল গুর্খা সৈন্য আর সেই সঙ্গে তাহাদের একজন ইংরাজ সেনাপতি বাস করিত। সেনাপতির পাহাড়ীদের উপরে যে মন্দ ভাব ছিল, তাহা নয়; কিন্তু গুর্খা সৈন্যগণ পাহাড়ের উপরে উঠিয়া পাহাড়ীদের উপরে এক এক সময় বড় জুলুম করিত। তাহারা পাহাড়ীদের বাগান হইতে তরকারি, গাছ হইতে ফল, গোয়াল হইতে গরুর দুধ লইয়া আসিত, পয়সা দেবার সময় এক টাকার জায়গায় চারি আনার বেশী দিতে চাহিত না। গুর্খাদের হাতে বন্দুক। পাহাড়ীদের সম্বল তীর ও ধনু; কাজেই তাহারা গুর্খাদের বড় ভয় করিত। একদিন পাহাড়ীরা দল বাঁধিয়া ইংরাজ সেনাপতির কাছে গুর্খাদের অত্যাচারের কথা জানাইল। সাহেব বিচার করিয়া, গুর্খাদের মাইনে কাটিয়া কিছু টাকা পাহাড়ীদের দিলেন এবং গুর্খাদের দশ ঘা বেত লাগাইলেন। গুর্খারা ভয়ানক চটিয়া গেল। তাহারা সমস্ত গুর্খা একত্র হইয়া পাহাড়ের উপরে উঠিয়া একদিন ছোট একটি গ্রাম লুট করিল। এইবার পাহাড়ীরাও প্রতিশোধ লইবার জন্য দল বাঁধিল। একদিন গুর্খাদের সেনাপতি একটি কাজের জন্য ডিব্রুগড় চলিয়া গেলেন, গুর্খারা তাদের একটি পর্ব্ব উপলক্ষে সমস্ত দিন আমোদ প্রমোদ করিয়া রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িল। সেই রাত্রেই পাহাড়ের লোকেরা দল বাঁধিয়া নিঃশব্দে আসিয়া প্রথমে গুর্খাদের বন্দুক, কামান অধিকার করিল, তাহার পরে তাহাদের কাটিয়া কুটিয়া চলিয়া গেল।

এই ঘটনায় ইংরাজদের সঙ্গে পাহাড়ীদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পাহাড়ীদের গায়ে যতই জোর থাকুক না কেন, ইংরাজের কামানের সামনে দাঁড়াইয়া করে এমন সাধ্য কাহার? ইংরাজ সৈন্যগণ কামানের গোলায় পাহাড়কে

পাহাড় উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। পাহাড়ের লোকেরা একদিন মাত্র যুদ্ধ করিল, তাহার পরেই অন্য এক পাহাড়ে পলাইয়া গেল। ইংরাজ সৈন্যগণ পাহাড়ীদের ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, একটি ছোট পাথরের ঘরে দুইটি বাঙ্গালী মেয়ে। সৈন্যদের সঙ্গে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন, তিনি নির্ম্মলার সঙ্গে কথা বলিয়া তাহাদের সকল দুঃখের কাহিনীই শুনিলেন। স্বর্গের দেব-বালিকার মতন দুইটি মেয়ের সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। তিনি সেনাপতি সাহেবকে বলিয়া দুইটি বালিকার প্রতিপালনের ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন। ডাক্তার সেনের নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না, তাই তাঁহার স্ত্রী, নির্ম্মলা ও সরযূকে পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। তাহারা দুটি বোন মিসেস্ সেনের কাছে পরম সুখেই বাস করিতে লাগিল।





ইংরাজদের সৈন্য পাহাড়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছে

—৫৪ পৃষ্ঠা।

নবম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার সেন একটি বড় সহরে বাস করেন। তাঁহার ঘরের ভিতরে নির্ম্মলা বসিয়াছিল। ডাক্তার সেনের স্ত্রী কল্যাণী দেবী তাহাকে রামায়ণের লবকুশের কথা শুনাইতেছিলেন। সে ছেলেবেলা হইতে পাহাড়ের অসভ্যদের কাছে রহিয়াছে, এ সব কথা কিছুই জানে না। এ সব কথা বলিয়া কেন, সভ্য সমাজের সে কিই বা জানে? নির্ম্মলা প্রথমে শুনিল, লবকুশ তাদের মা দুঃখিনী সীতার সঙ্গে বাল্মীকির তপোবনে থাকিত, গাছের ছাল পরিত, ফল খাইয়া বাঁচিত। তার পরে দুটি ভাই অযোধ্যার রাজপুরীতে আসিল। রামচন্দ্র দুইটিকে পুত্র বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন তাহাদের প্রাণে ভালবাসা ঢালিয়া দিলেন; সেখানে তাহাদের জন্য লক্ষ রকমের সুখের আয়োজন হইল। এ সবই নির্ম্মলার ভাল লাগিল। কিন্তু সীতার পাতালপুরীতে প্রবেশের কথা শুনিয়াই তাহার মন দুঃখে ভরিয়া উঠিল। সে কল্যাণী দেবীকে কহিল, "লবকুশ আর কি তাদের মাকে দেখ্‌তে পারে না? সীতা কি আর পাতাল হতে ফিরে আস্‌বেন না?"

কল্যাণী দেবী। না, আর ত মা ফিরে আস্‌বেন না।

এই কথা শুনিয়াই নির্ম্মলার চোখ জলে ভাসিতে লাগিল। কল্যাণী দেবী ভাবিলেন, নির্ম্মলার হয় ত নিজের মায়ের কথাই মনে পড়িয়াছে। তিনি কহিলেন, "লবকুশের মা সীতা আর পাতালপুরী হতে ফিরে অযোধ্যায় আসেন নাই, লবকুশ আর তাদের মাকে দেখ্‌তে পায় নাই বটে; কিন্তু তোমার মা অসভ্যদের দেশ থেকে ফিরে এলেও আস্‌তে পারেন, তাঁর সঙ্গে তোমাদের দেখা হতেও পারে। তিনি পাগলের মত ছুটে যদি নূতন এক অসভ্যজাতির গ্রামে গিয়ে পৌঁছে থাকেন, সেই অসভ্য জাতির

লোকেরা যদি তাঁকে যত্ন আদর করে রেখে থাকে, তিনি যদি ভাল হয়ে, তোমাদের সন্ধান কর্‌তে কর্‌তে এখানে এসে পড়েন, তা হলে কি সুখের কথাই হয়।"

এই সময় সরযূ ছুটিয়া আসিয়া কল্যাণী দেবীকে কহিল, "মা, রাস্তায় কি মজা, একবার এসে দেখুন না। সব ভূত বাজনা বাজায়ে চলে যাচ্ছে। দিদি, ভূত দেখ্‌বে ত আমার সঙ্গে এস না।"

সরযূ জন্মিয়া অবধি পাহাড়ের উপরে অসভ্যদের দেশেই ছিল। সে এখন সভ্যদেশের সহরের যা কিছু দেখে, তাহাই তাহার আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। চড়কপূজার একদল সং বাজনা বাজাইয়া গান গাহিয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছিল, সরযূর তাহাদেরই ভূত বলিয়া মনে হইয়াছে।

নির্ম্মলা ও সরযূ দুজনেই বালিকা। তবু ছোট বোনটির আনন্দ দেখিলে নির্ম্মলার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। এই ত সেদিন সরযূর জন্মদিন গেল। কল্যাণী দেবী সরযূকে চমৎকার সিল্কের পোষাক পরাইয়া, নিজের হাতেই লুচি, তরকারি, মিষ্টান্ন তৈরী করিয়া খাওয়াইতে-ছিলেন, তাহা দেখিয়া বালিকা নির্ম্মলার মনে যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা কে বর্ণনা করিবে? যে সরযূ পাহাড়ে থাকিতে মাসের মধ্যে একদিন স্নান করিত, ধূলায় গা ভরিয়া থাকিত, আধসিদ্ধ মাংস ও ফল খাইত, আজ সে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! তাহার মাধুরীভরা মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।

কিন্তু হায়, যাহারা নির্য্যাতন সহিয়া, দুঃখ পাইয়া, চোখের জল ফেলিয়াই দিন কাটাইবে তাহাদের এই সুখ আর কতদিনই বা থাকিবে? হঠাৎ জ্বর হইয়া কল্যাণী দেবীর মৃত্যু হইল। ডাক্তার সেন নিরুপায় হইয়া নির্ম্মলা এবং সরযূকে তাঁহাদের কলিকাতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি নিজে বহুদিনের ছুটি লইয়া বিলাতে বাস করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সেনের বড় ভাই আছেন, তিনি বিদেশে চাকুরী করেন।

তাঁহার স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী ছোট ছেলে মেয়ে আর চাকর চাকরাণী লইয়া কলিকাতার বাড়ীতেই থাকেন। তিনি বাড়ীর কর্ত্রী। নির্ম্মলা ও সরযূর ভার এখন তাঁহারই উপরে। তিনি সম্পর্কে কাত্যায়ণী দেবীর কেহ হন কি না, জানিতে বড় ইচ্ছা হয়; কারণ, তাহার মনটি কাত্যায়ণী দেবীর মতনই যেন শক্ত লোহা দিয়া তৈরী; নচেৎ যে নির্ম্মলা সরযূর মুখের পানে চাহিলে পাষাণ গলিয়া যায়, তাহাদের দেখিয়া মাতঙ্গিনী দেবীর মন গলে না কেন? তিনি দুটি মেয়েকে ঝি-চাকরাণীর মত হীন অবস্থায় রাখিয়াছেন কেমন করিয়া? তাহারা কলিকাতা সহরে আসিয়া কড়া শাসনে ভয়ে ভয়েই থাকে।

এই বাড়ীতে নির্ম্মলার উপরে বিশেষভাবে একটি কাজের ভার পড়িয়াছে, সে গিন্নির ছোট ছেলেটিকে রাখে। তা, ছেলে ছোট হইলে হয় কি? তাহার জুলুম যে বড় কম, তাহা নহে। তাহার যত হিংসা ও যত রাগ ঐ সরযূর উপরে। সরযূর এক দিদি ছাড়া আর কে আছে? সে ভয়ে ভয়ে দিদির আঁচল ধরিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু সরযূ নির্ম্মলার কাছে আসিলেই সেই দুরন্ত ছেলে রাগে ফুলিতে থাকে। তাহার পরে নির্ম্মলা যদি সরযূকে কাছে ডাকিয়া একটু আদর করে;—ওরে বাপ্ রে, সে ছেলে তখনি সরযূকে কামড়াইবে, তাহার চুল টানিয়া ছিঁড়িবে, তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবে, অবশেষে বলিবে, "তুই এখানে মর্‌তে এসেছিস্ কেন? তোর ঘরে যা না।"

দৈবাৎ কোন দিন সেই আব্দারে ছেলেকে সরযূ যদি কিছু বলে, অমনি তার কান্না। কান্না শুনিয়া তাহার মা ছুটিয়া আসিয়া বলেন, "বাবা, তোমাকে কে কি বলেছে? কে মেরেছে?"

ছেলে বলে, "ঐ সরযূ আমাকে মেরেছে।"

মা সেই মিথ্যাবাদী ছেলের কথাই বিশ্বাস করেন এবং সরযূর গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিয়া বলিতে থাকেন—"বটে! তোমার এমনি

সাহস, তুমি আবার আমার ছেলের গায়ে হাত তোল? ফের যে দিন হাত তুল্‌বে, সেদিন ঐ হাত উনানের জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে পুড়িয়ে দেব না?"

সরযূ এখন আর দিনের বেলায় দিদির কাছে আসে না। আসে না ভয়েও বটে, অন্য কারণেও বটে। বাড়ীর ঝি হরিমতী অতটুকু মেয়েকে ধরিয়াই বাসন মাজায়। না মাজিলে আর কি রক্ষা আছে? তাহার কাছে চড় চাপড় খাইতে হয়। তা সরযূর কথাই বা বলি কেন? নির্ম্মলাও হরিমতী ঝিকে ভয় করিয়া চলে, তাহার হুকুমে মাছ কোটে, মসলা বাটে, কয়লার উনান ধরায়, আবার বাসনও মাজে। দুটি বোন বে-ওয়ারিস, বাড়ীর যার খুসী, সে-ই দুজনের দ্বারা কাজ করাইয়া লয়। তবু যদি দুটি বোন ভাল খাইতে পরিতে পারিত, তাহা হইলেও তত দুঃখের কথা ছিল না। একবার চাহিয়াই কেন দেখ না, দুটি মেয়ের পরণে ময়লা দুইখানি কাপড়; গায়ে সেমিজ কি জামা কিছুই নাই। খাবার, সকালবেলা কিছু মুড়ি, আর বেলা বারটায় ও রাত্রি দশটায় দুটি ভাত। বিকালে মেয়ে দুটির ভাগ্যে কিছুই জোটে না।

তবে রাত্রিটি যে তাহাদের সুখে কাটে, সে কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। নির্ম্মলা বিছানায় শুইয়া, ছোট বোনটিকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার সমস্ত ভালবাসা সরযূর প্রাণে ঢালিয়া দেয়। তখন ছোট-বোনের পুলকভরা মুখখানি নির্ম্মলার কাছে বড়ই মিষ্ট বলিয়া মনে হয়।

একবার সরযূর জ্বর হইল। সকাল হইতে বেলা চারিটা পর্য্যন্ত সে জলটুকুও স্পর্শ করিল না। বেলা সাড়ে চারিটার সময় ঘাম হইয়া তাহার জ্বর ছাড়িল। তখন তাহার ভয়ানক ক্ষিদে পাইল। সে নির্ম্মলাকে কহিল, "দিদি, আমাকে কিছু খাবার দাও।"

নির্ম্মলা বাড়ীর কর্ত্রীকে কহিল, "গিন্নিমা, সরযূর আজ জ্বর হয়েছিল। এখন আর জ্বর নাই। তার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। একটু সাবু ও মিছ্‌রি দিন না, তাকে খেতে দেব।"

গিন্নি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ীতে সাবু মিছ্‌রি জন্মায় নাকি যে, তুমি তা যখন চাবে তখনি পাবে। মিছ্‌রির দরকারই বা কি? আজই ত জ্বর হয়েছে, আর এখনি খাবার চাই? দুই এক দিন কিছুই না খেয়ে থাকুক না, তা হলে আর ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না, আপনা হতেই জ্বর সেরে যাবে।"

এ কথার পরে নির্ম্মলা আর কি বলিবে? কিন্তু সরযূ ক্ষুধার জ্বালায় বড়ই কাঁদিতে লাগিল। তখন নির্ম্মলা এক মতলব করিয়া সাহসে বুক বাঁধিল। এই বাড়ীরই একটি স্নেহময়ী মেয়ে কয়েকদিনের জন্য শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল। সে নির্ম্মলাকে উলের সূতায় মোজা এবং আরও কয়েক রকম জিনিষ তৈরী করিতে শিখাইয়া, কয়েক টাকার সূতা কিনিয়া দিয়াছিল। নির্ম্মলা সেই সূতায় কয়েক জোড়া মোজা তৈরী করিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল তাহাদের বাড়ীর একটু দূরেই মেয়েদের একটি বোর্ডিং আছে। আজ নির্ম্মলা কয়েক জোড়া মোজা হাতে লইয়া বিক্রির জন্য, বোর্ডিংয়ের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

সে দিন রবিবার, ছুটির দিন। বোর্ডিংয়েব মেয়েরা বসিয়া নানা কথা বলিতেছিল। একটি মেয়ের নাম নলিনী। সে অন্য মেয়েদের কহিল, "এবার বাড়ীতে যে হাসির ব্যাপার হয়েছিল, তা আর কাকে বলি? জানই ত, আমাদের রামা ও হরে এই দুইটি চাকর খুব ফূর্ত্তি টুর্ত্তি করতে ভাল বাসে। পূজার ছুটিতে আমার দাদা কলেজে কি অভিনয় কর্‌বার জন্যে এক দোকান থেকে রাজার পোষাক ভাড়া করে এনে ছিলেন। তিনি সেই পোষাক দোকানে পাঠাবার জন্য রামার হাতে দিলেন। রামা সেই পোষাক দোকানে না দিয়ে আপনার ঘরেই রেখে দিল। তার পরে একদিন দুপুর বেলায় পুরুষ মানুষ কেউ বাড়ীতে নেই, আমরা মেয়েরা ভিতর বাড়ীতে শুয়ে আছি; এমন সময় রামা বৈঠকখানায় পাড়ার চাকরদের ডেকে অভিনয় আরম্ভ করে দিল। সে

নিজে রাজার পোষাক পরে রাজা সেজেছে, আবার বৌদিদি তাঁর চমৎকার একখানা রেশ্‌মি শাড়ী ধোপার বাড়ী পাঠাবার জন্যে রামার হাতে দিয়েছিলেন; রামা সেই শাড়ী হরেকে পরিয়ে তাকে রাণী সাজিয়েছে। অভিনয় আরম্ভ হবার পরেই হঠাৎ আমাদের কেরাণী বাবু এসে উপস্থিত। আর রামা যায় কোথায়? কেরাণী বাবু বাঘের মতন গর্জ্জন করে বলে উঠলেন, "তবে রে নির্লজ্জ বেহায়া, দুপুর বেলায় যাত্রা আরম্ভ করে দিয়েছিস্।"

ননী বলে একটি মেয়ে কহিল, "তার পরে কি হল?"

নলিনী কহিল, "কেরাণী বাবুর চীৎকার শুনেই আমরা বৈঠকখানা ঘরে গেলাম। সেখানে গিয়ে হেসে আর বাঁচিনে। হরে ছেলেটা দেখ্‌তেও বেশ সুন্দর, আর তার মাথায়ও লম্বা চুল। বৌদিদির শাড়ীখানা পরায়, ঠিক তাকে রাজবাড়ীর মেয়ে বলেই মনে হচ্ছিল।"

ঠিক্ এই সময়ে নির্ম্মলা সেই মেয়েদের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েরা দেখিল, ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি, কিন্তু পরণে অত্যন্ত মলিন একখানি কাপড়, গায়ে ত কিছুই নাই। দুঃখিনী মেয়েটির উপরে সকলেরই দয়া হইল। কয়েকটি মেয়ে আসল দামের চেয়েও কিছু বেশী দিয়া, নির্ম্মলার হাতের মোজা কিনিয়া রাখিল। শুধু তাহাই নহে; মেয়েরা নির্ম্মলার বোনটির জ্বরের কথা শুনিয়া, বোডিং হইতেই কিছু পয়সা সংগ্রহ করিল; সেই পয়সায় কমলানেবু, বেদানা, বিস্কুট ও মিছ্‌রি কিনিয়া নির্ম্মলার হাতে দিল। নির্ম্মলা বাড়ীতে পৌছিয়া ঐ সকল যখন সরযূকে খাইতে দিল, তখন তাহার আর সুখের সীমা রহিল না। সে কহিল, "দিদি কমলানেবু, বেদানা ও বিস্কুট শুধু আমিই কেন খাব? তুমিও খাও।"

দশম পরিচ্ছেদ

নির্ম্মলা ও সরযূ যে বাড়ীতে থাকে, তাহারই নিকটে এক বাড়ীতে যাত্রা হইতেছিল। সেখানকার বাজনা ও গান শুনিয়া বাড়ীর আব্দারে ছেলেটি যাত্রা শুনিতে যাইবার জন্য আব্দার আরম্ভ করিল। অমনি মায়ের হুকুম হইল, "নির্ম্মলা, এখনি খোকাকে যাত্রা শুনাতে নিয়ে যাও।" তা, যাত্রা শুনিতে যায় ত যাউক না, তাহার গলায় আবার সোনার হার পরাইয়া ভিড়ের মধ্যে পাঠানো কেন? গিন্নির যে কি রকম বুদ্ধি, তাহা কে বলিবে? নির্ম্মলা সেই আব্দারে ছেলে আর নিজের বোন সরযূকে লইয়া যাত্রা শুনিতে গেল। তাহারা অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া যাত্রার আসরে ঢুকিল।

সে দিন 'রামরাবণের যুদ্ধ' যাত্রা হইতেছিল। প্রথমে জন কয়েক লোক গায়ে লোম লাগাইয়া, মুখে কালি মাখিয়া, পেছন দিকে একটি লেজ জুড়িয়া হনুমান সাজিয়া আসরে আসিল। তার পরেই রাক্ষসের দল দেখা দিল। তাহাদের মুখে, রঙমাখা দাঁত বাহির করা রাক্ষসের মুখোস। বাজনা বাজিল, সেই সঙ্গে রাক্ষস আর হনুমানের দল হাতে এক একখানা গাছের ডাল লইয়া ধেই ধেই নাচিতে লাগিল। নাচের পরে দুই দলের কথা কাটাকাটি চলিল। এক রাক্ষস এক বানরকে কহিল—

"কোথায় সে হনুমান রয়েছে পালায়ে,
যে দিল সোনার লঙ্কা আগুনে জ্বালায়ে।
সে ব্যাটার রক্ষা নাই রাবণের রাগে,
কাণ ধরে নেব তারে সকলের আগে।

রাঙা রক্ত খাব এই দাঁতে পেট চিরে,
দেখিব কেমন তোরা ঘরে যাস্ ফিরে ?"

একটা বানর ঐ কথার জবাবে কহিল,—

"কি বলিস্ ? রক্ত খাবি ? হায়, হায়, হায়,
বীর হনুমান সে কি রাবণে ডরায় ?
গালে চড় মেরে দেব দাঁত ভেঙ্গে তোর ;
সীতারে করিল চুরি দশানন চোর।
জানে কি সে রামচন্দ্র এই ধরণীর,
ধার্ম্মিক মহৎ শ্রেষ্ঠ দয়াবান্ বীর ?
সীতা বরণীয়া নারী দেবীর মতন,
দেবর দেবতা সম সাহসী লক্ষণ।
কোথায় রাবণ ? দশ মুণ্ড ছিঁড়ে তার,
রামের চরণপদ্মে দেব উপহার।"

আবার বাজনা বাজিল, দুই দলে লড়াই আরম্ভ হইল। নির্ম্মলা ও সরযূ উহা দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির। অবশেষে দুঃখিনী সীতা আসরে আসিলেন, রাক্ষুসীরা তাঁহার কোমল অঙ্গে প্রহার করিতে লাগিল। সীতার দুঃখ দেখিয়া নির্ম্মলা আর চোখের জল রাখিতে পারিল না।

যাত্রা শেষ হইলে পরে, মানুষগুলি ঠেলাঠেলি করিয়া আসর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল। এই গোলমালের ভিতর কখন কে যে বাড়ীর দুরন্ত ছেলেটির গলার হার চুরি করিল, নির্ম্মলা তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ছেলেকে লইয়া বাড়ীতে আসার পরে গিন্নি বল্লেন, "খোকার সোনার হার কি হল ?"

আর হার কি হইল ? সে ত চুরি গিয়াছে। কিন্তু গিন্নি নির্ম্মলা ও সরযূকে কহিলেন, "ও হার তোমরাই চুরি করেছ, এখনি তোমাদের ধরে পুলিসের হাতে দেব।"

এই কথা শুনিয়া ভয়ে নির্ম্মলার মুখ শুকাইয়া গেল। সে কহিল, "গিন্নি মা, সত্যি বল্‌ছি, আমরা হার চুরি করি নি; আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের পুলিশের হাতে দিবেন না; পুলিশ যে মেরে আমাদের খুন কর্‌বে।"

গিন্নি বলিলেন—"খুন কর্‌লে আমার কি হবে? পুলিসের হাতে না দিলে আমিই কি ছেড়ে কথা বল্‌ব নাকি? মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব না?"

গিন্নি একখানা লোহার হাতা হাতে লইয়া দুটি মেয়েকে খুব মারিলেন, তাহার পরে একটি ছোট ঘরে তাহাদের বন্ধ করিয়া রাখিলেন; বলিলেন, "আজ আর তোমাদের নাইতেও দেব না, খেতেও দেব না। সমস্ত দিন এই ঘরেই দুজনকে বন্ধ করে রাখ্‌ব।"

দুটি বোন অনাহারে বেলা চারিটা পর্যান্ত ঘরের ভিতরেই বন্ধ রহিল। তাহার পরে কি জানি কি ভাবিয়া গিন্নি ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু কিছু খাইতে দেবার নামও করিলেন না। অথচ তিনি মনে মনে বেশ বুঝিয়াছেন, ঐ দুটি মেয়ের কেহই হার চুরি করে নাই, তেমন স্বভাবই তাদের নয়; ভিড়ের মধ্যে চোরই হার চুরি করিয়াছে।

নির্ম্মলা আজ আবার তাহার ছোট বোনটিকে সঙ্গে লইয়া মোজা বিক্রি করিবার জন্য সেদিনকার সেই মেয়েদের বোর্ডিংয়ে চলিল। আমরা অনেক দিন আগে যে সরলা মেয়েটির কথা বলিয়াছি, সে পড়াশুনা করিবার জন্য দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা আসিয়াছে এবং মেয়েদের বোর্ডিংয়েই আছে। আজ ছুটির দিন কি না, তাই সে একটি ঘরে বসিয়া ছবি আঁকিতেছিল। এমন সময়ে তাহারই ঘরের কাছে নির্ম্মলা ও সরযূ গিয়া দাঁড়াইল। সরলা চাহিয়া দেখিল পরীর মতন সুন্দর দুটি মেয়ে, অথচ তাহাদের পরণের মলিন কাপড় দেখিয়া মনে হয়, তাহারা বড়ই দুঃখিনী। সরলা মেয়ে দুটিকে কাছে ডাকিয়া, বড় মেয়েটিকে কহিল, "তোমার নাম কি?"

নির্ম্মলা। আমার নাম নির্ম্মলা।

সরলা। তোমরা কোন্ জাত?

নির্ম্মলা। বামুন।

সরলা। তুমি কি কর?

নির্ম্মলা। ছেলে মেয়ে রাখি।

সরলা। তোমাদের আর কে আছেন?

নির্ম্মলা। কেউ নেই।

সরলা। সে কি? তোমাদের কেউ নেই? তবে তোমরা কোথায় থাক?

নির্ম্মলা তাহাদের সমস্ত কাহিনী সরলাকে বলিল। সরলা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে নির্ম্মলাকে কহিল, "তুমি বল্‌ছ, তোমাদের এক দাদা ছিলেন, তিনি জলে ডুবে মরেছেন, সে দাদার নাম কি ছিল?"

নির্ম্মলা। সুরেশ।

সরলা আপন মনে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এই দুটি মেয়ে তা হলে সুরেশ দাদারই বোন্। তিনি ত আমাকে তাঁর জীবনের কাহিনী বল্‌বার সময় বলেছেন, নির্ম্মলা নামে তাঁর একটি বোন ছিল। এদের চেহারা দেখ্‌লে ত সুরেশ দাদার কথাই মনে পড়ে।"

সরলা তৎক্ষণাৎ মেয়ে দুইটিকে লইয়া বোর্ডিংয়ের কর্ত্রীর কাছে গেল। অনেক মেয়ে সেখানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সরলার অনুরোধে নির্ম্মলা আবার করুণস্বরে তাহাদের সমস্ত কাহিনী বলিয়া গেল। সরলা কহিল, "মেয়ে দুটি তাদের যে দাদার কথা বল্‌ছে, তিনি বেঁচে আছেন। কিছুদিন দার্জ্জিলিঙ্গে আমাদের বাড়ীতে তিনি ছিলেন। আমার মা তাঁকে আপনার ছেলের মত এবং আমি তাঁকে ভাইয়ের মতনই মনে করতুম। কিন্তু এখন তিনি নিরুদ্দেশ, কোথায় যে আছেন, আমরা তা কিছুই জানি না।"

বোর্ডিংয়ের কর্ত্রী কহিলেন, "সরলা, আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ছুটি মেয়ের চোখ মুখ একেবারে তোমারই মতন। মেয়ে ছুটি যেন তোমারই বোন।"

ছুটি মেয়ের উপর সরলার মনটা যেন একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল, ভালবাসায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সরলা কহিল, "তোমাদের মুখ দেখে মনে হয়, তোমরা ছুজনেই খুব কেঁদেছ; কি হয়েছিল, বল ত?" আজ তোমরা কিছু খেয়েছ?"

নির্ম্মলা। আজ আমরা কিছুই খেতে পাই নি। গিন্নির ছেলের হার চুরি গিয়াছে কি না,—আমরাই তা চুরি করেছি মনে করে গিন্নি আমাদের একটি ঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করে রেখেছিলেন।

বোর্ডিংয়ের মেয়েরা কহিল, "মাগো মা! গিন্নি কি রকম মানুষ? তোমরা আবার হার চুরি করবে? এমন মিথ্যা কথায় কার বিশ্বাস হবে?"

সরলার ছুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে এই কয়েক মাস হইল এখানে আসিয়াছে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ অবাক্ হইয়া গিয়াছেন।

আজ সরলার জন্মদিন। তাই বোর্ডিংয়ের সবাইকে খাওয়াইবার জন্য তাহার পিতা টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। সকলের খাবার জন্য লুচি, তরকারি, মাংস ও মিষ্টান্ন রান্না করা হইয়াছে; দই, সন্দেশ, রসগোল্লা ও নানা রকম সুমিষ্ট ফল বাজার হইতে কিনিয়া আনা হইয়াছে। সরলা স্বহস্তে ছুখানি থালায় ও রেকাবে খাদ্যসামগ্রী সাজাইয়া খাবার ঘরে লইয়া গেল, তাহার পরে মেয়ে ছুটিকে সেখানে ডাকিয়া, সে তাহাদের কাছে বসিয়া নানা রকম খাবার খাওয়াইতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া বোর্ডিংয়ের ছাত্রী শোভা সুধাকে কহিল—

"সত্যি ভাই, সরলা দিদি যে কি রকম ভাল মেয়ে, আমি যেন তা বলে বোঝাতে পারি নে। রাজার মেয়ের মত দেখতে সুন্দরী, বাড়ীর অবস্থাও

খুব ভাল, অথচ বাবুগিরি কি অহঙ্কার একটুকু নেই; মুখে একটি মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। পড়াশুনাতে ত সকলের চেয়েই ভাল।"

নির্ম্মলা ও সরযূর খাওয়ার পরে, সরলা দুটি বোনকে আপনার ঘরে লইয়া গেল এবং তাহাদের কাছে বসাইয়া কহিল, "আমাকে দিদি বলে ডেক। প্রত্যেক রবিবার বিকালে আমার কাছে এস।"

সরযূ অবাক্ হইয়া সরলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নির্ম্মলা যে কি বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মা নিরুদ্দেশ এবং ডাক্তার সেনের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পরে, আর কাহার কাছে সে এমন প্রাণভরা ভালবাসা পাইয়াছে?

সরলার সুকুমার হৃদয় মেয়ে দুটির উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে প্রতি রবিবার তিনটার সময় তাহাদের জন্য পথের পানে চাহিয়া থাকিত। নির্ম্মলা ও সরযূ কাছে আসিলে তাহাদের মুখ দেখিয়া সরলার চক্ষু যেন জুড়াইয়া যাইত। সে প্রথমে দুটি মেয়েকে মিষ্ট দ্রব্য ও ফল খাওয়াইত তাহার পরে বই পড়াইত ও গান শিখাইত। এক এক দিন তাহারা সরলার কাছে গল্প শুনিত।

এক রবিবার নির্ম্মলা ও সরযূ সরলার কাছে আসিয়া কহিল, "দিদি আজ একটা গল্প বলুন।" সরলা হাসিয়া গল্প আরম্ভ করিল—

"এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটির নাম অশ্রুমুখী। সে দেখ্‌তে টুকটুকে ক্ষীরের পুতুল, আর সে খুব ভাল মেয়ে। তাই সকলেই তাকে ভালবাস্‌ত, শুধু তার সৎমা ছোটরাণী তাকে দুই চোখে দেখ্‌তে পারতেন না। তার পরে অশ্রুমুখীর নিজের মা মরে গেল।"

নির্ম্মলা। তাই নাকি? নিজের মা মরে গেল? কেন?

সরলা। ছোট রাণী তাকে যন্ত্রণা দিত বলে। শেষকালে কি হল, শোন। রাজা নিজেই অশ্রুকে ভালবেসে মানুষ করতে লাগ্‌লেন। তার

দুই ভায়েরও বোনটির উপরে খুব ভালবাসা ছিল। কিন্তু ছোট রাণী অশ্রুকে রাজবাড়ী থেকে তাড়াবার চেষ্টা কর্‌তে লাগলেন।

সরযূ। ছোট রাণী ত তা হলে ভয়ানক দুষ্টু।

সরলা। দুষ্টু বই কি! অশ্রুর উপরে অত হিংসা কেন, তা জান? তাঁর নিজের মেয়েটি দেখ্‌তে ভারি কুৎসিত; তার গায়ের রং একেবারে দোয়াতের কালি, বড় বড় এক একটা দাঁত যেন রাঙা মূলো, মস্ত কাণ দুটি যেন দুখানি কুলো। চোখের ভুরু নেই বল্লেও হয়। মাথার চুলগুলি সুমুখের দিক থেকে উঠেই যাচ্ছে।

নির্ম্মলা। দিদি, তা হলে ত অমন মেয়েকে কোন রাজার ছেলেই বিয়ে কর্‌বে না।

সরলা। তা ত কর্‌বেই না, সেই জন্যেই ত ছোট রাণীর আরো রাগ। কেউ তাঁর নিজের মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায় না, কোন মানুষই সে মেয়েকে ভাল বলে না, আর কি না এক গুণবান রাজপুত্রের সঙ্গেই অশ্রুর বিয়ে হবে, রাজ্যের সমস্ত লোক তার প্রশংসা করে;—এ সব ছোট রাণীর মোটেই সহ্য হয় না। তাই তিনি এক মায়াবিনী স্ত্রীলোককে গোপনে ডেকে বল্লেন, "তোর মায়া মন্ত্রে রাজকুমারী অশ্রুমুখীকে একটা হরিণ কর্‌তে পার্‌বি কি না বল্ দেখি? তা পার্‌লে আমার গলার মুক্তাহার তোকে বকশিস্ দেব।"

নির্ম্মলা। মানুষ আবার হরিণ হয় কি করে? মিথ্যা কথা।

সরলা। তা ত বটেই, এ যে গল্প। তার পরে কি হল শোন। মায়াবিনী তার আশ্চর্য্য মায়ামন্ত্রে রাজকন্যাকে একটি সোনার হরিণ কর্‌ল। হরিণটি রাজবাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। তবুও দুষ্টু রাণীর নিজের লোক হরিণটিকে জঙ্গলের ভিতরে এক পাহাড়ের উপরে রেখে এল। এ দিকে রাজবাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। অশ্রুমুখী কোথায়? রাজার সিপাহি কেউ বা ঘোড়ায় কেউ বা হাতীতে চড়ে, তার

কত খোঁজ করে বেড়াতে লাগ্‌লো কিন্তু কোথাও রাজকন্যার খোঁজ পাওয়া গেল না। ভায়েরা ত বোনটির জন্য কেঁদেই সারা। রাজাও মনের দুঃখে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন।

সরযূ। দিদি, অশ্রুর জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

সরলা। অনেক দিন পরে অশ্রুর দুই ভাই, হাতী, ঘোড়া, তীর, ধনুক ও তলোয়ার নিয়ে বনে হরিণ শিকার করতে চল্লেন। জঙ্গলে পাহাড়ের কাছেই ঝরণা। একটি সুন্দর হরিণ সেই ঝরণার জল খাচ্ছিল। দুই রাজপুত্র হরিণটিকে দেখে ধনুক হাতে নিলেন, যখন দুজনেই হরিণের গায়ে তীর ছুঁড়ে মার্‌বেন, তখন হরিণটি দুই রাজপুত্রের পানে চেয়ে বল্লে—

"মেরো না মেরো না আমায় ভাই,
আমার মতন দুঃখিনী কেউ নাই।"

দুই রাজপুত্র হরিণের মুখে মানুষের মতন কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেল। তাঁরা হরিণটিকে ধরে রাজবাড়ীতে নিয়ে চল্লেন। দুজনে যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার এক গাছের উপরে ছিল শুক আর শারী; অর্থাৎ একটি পুরুষ টিয়ে আর একটি মেয়ে টিয়ে। শারী শুককে বল্লো, "দেখেছ, দুই রাজপুত্র কেমন একটি সুন্দর হরিণ নিয়ে যাচ্ছে?" শুক বল্লো, "তুই বড় বোকা কি না, তাই বল্‌ছিস্ ওটা হরিণ।" শারী বল্লো, "মা গো, ওটা হরিণ নয় ত কি? চোখ নেই নাকি?" আবার শুক বল্লো, "আসল কথাটা কি জানিস্? অশ্রুমুখী নামে এক রাজকন্যা ছিল। তার সৎমার কাছে মুক্তাহার বকশিস্ পেয়ে, এই রাজ্যের এক মায়াবিনী তাকে হরিণ করে রেখেছে।"

সরযূ। দিদি তার পরে কি হল?

সরলা। শুকের কথা শুনে দুই রাজপুত্রের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তাঁরা রাজার কাছে হরিণটিকে নিয়ে গেলেন এবং শুক-শারীর কথাও রাজাকে বল্লেন। হরিণটিকে দেখেই রাজার মনে স্নেহ

উথ্‌লে উঠ্‌লো। তিনি সেটিকে কাছে নিয়ে গায়ে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন। রাজার হুকুমে সিপাহিরা তখনি মায়াবিনীর দুই হাত বেঁধে রাজসভায় নিয়ে এল। রাজা বল্লেন, "ওরে মায়াবিনী, তুই এই হরিণকে এখনি রাজকন্যা করে দে, নইলে ঐ যে জল্লাদ তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে তোর মাথা কেটে রক্ত নিয়ে কুকুরকে খাওয়াবে।" মায়াবিনীর মন্ত্রে হরিণ আগের মতনই রাজকন্যা হয়ে রাজার পাশে দাঁড়ালো। তখন রাজা বল্লেন, "এস মা, আমার আরো কাছে এস, তুমিই আমার কন্যা অশ্রুমুখী? তোমাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।" দুই রাজপুত্র বল্লেন, "তুমি আমাদের স্নেহের বোন? তোমাকে পেয়ে মনে যে আনন্দ ধরে না।" হরিণই রাজকন্যা হয়েছে শুনে রাজবাড়ীতে দলে দলে লোক ছুটে আস্‌তে লাগলো, সকলেই রাজকন্যাকে দেখে খুব সুখী হলো। আচ্ছা, কার ভয়ানক দুঃখ হল, বল ত?

নির্ম্মলা। দুঃখ হল দুষ্টু ছোট রাণীর। আমার ত মনে হয়, রাজা রাণীকে আর মায়াবিনীকে মাটিতে পুঁতে ফেল্‌তে হুকুম দিবেন।

সরলা। ঠিক বলেছ, রাজার হুকুমে জল্লাদ মাটির ভিতর প্রকাণ্ড গর্ত্ত করে, দুষ্টু রাণীর ও মায়াবিনীর হাত পা বেঁধে, তার মধ্যে ফেলে দিল। তার পরে সে মাটি দিয়ে গর্ত্তের মুখ বন্ধ কর্‌ল।

সরযূ। বেশ হল, আমি খুসী হলুম।

—•—

একাদশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে এপ্রিল মাস আসিয়া পড়িল। সেই সময়ে গ্রীষ্মের ছুটি হইবে, সরলা দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইবে। যাওয়ার দিন সরযূ সরলাকে কহিল—"দিদি, আপনি দার্জ্জিলিং যাবেন না।"

সরলা। গেলে কি তোমার কষ্ট হবে?

সরযূ কিছুই বলিতে পারিল না, তাহার মুখখানি ম্লান হইল। সরলা কহিল—"চল না সরযূ, তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাই।"

সরযূ। তা হলে আমার দিদির যে বড় কষ্ট হবে।

নির্ম্মলা। আমি যে সরযূকে ছেড়ে থাকৃতে পারি নে।

সরলা যেদিন দার্জ্জিলিং চলিয়া গেল, সে দিন দুটি মেয়ের জন্য তাহার ত কষ্ট হইলই, কিন্তু নির্ম্মলা ও সরযূ বড়ই কাঁদিতে লাগিল।

সরলা দার্জ্জিলিঙ্গে পিতামাতার নিকটে গিয়া পৌঁছিল। তাহার পরে এক সপ্তাহ ধরিয়া দিনরাত বৃষ্টি। যে দিন বৃষ্টি থামিয়া গেল, খুব রৌদ্র উঠিল, সে দিন সরলার মা, মেয়েকে কহিলেন, বাক্স খুলে কাপড় জামাগুলি রদ্দুরে দাও ত।"

সরলা কয়েকটি বড় বড় বাক্স খুলিল এবং তাহার ভিতরের কাপড়-গুলি রৌদ্রে শুকাইতে দিল। একটি ঘরে অনেক দিনের একটি পুরাতন বাক্স পড়িয়াছিল। সকলেই মনে করিত, সেই বাক্সটির মধ্যে কতকগুলি অনাবশ্যক পুরাতন জিনিষ পড়িয়া আছে। কিন্তু সরলা সেই বাক্সটি খুলিয়া, তাহার ভিতরে ছোট একটি ফ্রক দেখিতে পাইল। ফ্রকটির উপরে রাঙা সূতায় যা লেখা রহিয়াছে, তাহা পড়িয়া সরলা এ রকম বিস্মিত হইল যে, কোন মায়াবীর মায়ামন্ত্রে তাহাদের সুবৃহৎ টিনের

ঘর হঠাৎ স্বর্ণ অট্টালিকায় পরিণত হইলেও সে তেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইত না। সরলা দেখিল, ফ্রকের গায়ে রাঙা সূতায় লেখা আছে—"সুহাসিনীর জন্মদিনে উপহার। সুরেশ দাদা, ডিব্রুগড়।"

সরলা ছোট ফ্রকটি হাতে লইয়া তখনি মায়ের কাছে গেল এবং কহিল, "মা, সুরেশদাদার যে দুটি বোন জলে ডুবে মরেছে, তার বড়টির নাম ছিল সুহাসিনী। কি আশ্চর্য্য! সুহাসিনীর একটি ফ্রক আমাদের বাক্সে এল কি করে?"

সরলার মাতা কমলাদেবী ফ্রকটি দেখিলেন এবং তাহার লেখাটিও পড়িলেন। তাহার মুখ একেবারে বিষণ্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "সরলা, তোমার বাবাকে একটিবার এখানে ডেকে নিয়ে এস ত।"

সরলা তাহার পিতা নগেন্দ্রনাথকে মায়ের কাছে ডাকিয়া আনিল। তিনি ফ্রকটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পরে সরলাকে কহিলেন, "মা, এক বিষয়ে তোমার কাছে আমাদের বড় অপরাধ আছে। তুমি কি সেই অপরাধ মাপ করতে পারবে? তুমি কি বাপ মা মনে করে আমাদের কাছেই থাকবে, না অন্য কোথাও চলে যাবে?"

সরলা। বাবা, তুমি কি বলছ? আমার কাছে তোমাদের আবার অপরাধ? আমিই ত দিনের মধ্যে দশবার তোমাদের কাছে অপরাধ করে থাকি। তোমাদের কাছে না থাকলে, আমি আর যাব কোথায়?

নগেন্দ্রনাথ। তুমি আমাদের আপনার মেয়ে নও। আমরা একবার আসামের পরশুরাম তীর্থে গিয়েছিলাম; তীর্থ হতে ফিরে আসার সময়ে, ব্রহ্মপুত্র নদীর এক জেলের নৌকায় তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম। তোমার পরীর মতন সুন্দর চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল, তুমি জেলের মেয়ে নও, তারা তোমাকে কোথাও পেয়ে কুড়িয়ে এনেছে। কে বলবে তোমাকে দেখেই কেন আমাদের স্নেহের উদয় হল? তাই অনেক টাকা

দিয়ে জেলেদের বশ করলেম এবং তাদের নৌকা হতে তোমাকে আমরা নিয়ে এলাম। তার পরে আমারাই তোমাকে লালন পালন করে মানুষ করেছি। যে ঝড়ের রাত্রে সুরেশদের নৌকা ডুবে যায়, জেলেরা সেই রাত্রেই নদীর তীরে বালির উপরে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল। এই ফ্রকটি তোমারই। তোমার নাম কি, তখন আমরা তা জিজ্ঞেস করেছিলুম, তুমি আধ আধ ভাষায় বলেছিলে, 'আমার নাম সুহাসিনী,' শেষকালে আমরাই তোমার নাম সরলা রেখেছিলুম। তুমি যে আমাদেরই মেয়ে, এই কথাটা আমরাই তোমাকে বলে বলে শিখিয়েছিলুম। এতদিন তোমার এই ফ্রকটির কথা মনেই ছিল না। আজ এইটি পেয়ে একটি রহস্যকথা বুঝ্‌তে পারা গেল। তুমি যে সুরেশ এবং নির্ম্মলা ও সরযূরই বোন, সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ই রইল না। এখন সুরেশ ইচ্ছা করলেই তোমাকে আমাদের নিকট হতে নিয়ে যেতে পারে।"

সরলা আর কি বলিবে? সে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া, দুখানি হাত যোড় করিয়া কহিল, "করুণাময় ঈশ্বর, আমার যা স্বপ্ন ছিল, তা আজ সত্য হয়ে গেল! আমাকে সুরেশদাদার বোন বলে কল্পনা করতুম, তুমি যথার্থই আমাকে তাঁর বোন করলে? আর প্রাণের দুটি বালিকা নির্ম্মলা ও সরযূও আমার আপনার বোন হল? আমি অবোধ বালিকা, তোমাকে ধন্যবাদ করবার উপযুক্ত ভাষা ত আমার নেই।"

সরলার দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কমলাদেবী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, আমাদের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে তোকে মানুষ করেছি, তুই আমাদের ছেড়ে কোথাও যাস্ নে।"

সরলা কমলাদেবীর বুকে মাথা রাখিয়া কহিল, "মা, আমি কি তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারি? তোমরা কেন বলছ, আমি তোমাদের মেয়ে নই? স্বয়ং ঈশ্বরই আমাকে তোমাদের মেয়ে

করে দিয়েছেন, কে আমাকে তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে ? এমন শক্তি কার ? আমি শুধু মাঝে মাঝে সুরেশদাদাকে আর নির্ম্মলা ও সরযূকে দেখ্‌তে চাই, তাদের ভালবাসা দিতে চাই, তা ছাড়া আর ত কিছুই আমি চাই নে।"

সরলা নগেন্দ্রনাথকে কহিল, "বাবা, তুমি খবরের কাগজে সুরেশদাদার জন্য একটি বিজ্ঞাপন দাও। তাঁর বোনদের যে পাওয়া গিয়াছে, সে কথাও যেন বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে। আমার আশা হয়, তা হলেই তিনি এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।"

নগেন্দ্রনাথ সেই দিনেই কয়েকখানি সংবাদপত্রে সুরেশের সন্ধান পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন ছাপিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সুরেশ যে কোথায় কি ভাবে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরে তাহার জীবনের কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, এখন সে বিষয়ে বর্ণনা করিব।

সুরেশ ঘুরিতে ঘুরিতে পাটনা সহরে আসিয়া পৌঁছিল। পাটনা সহর খুব বড়, সেখানে বিস্তর লোক ; কিন্তু সুরেশ কোথায় যাইবে ? কাহাকেও ত সে জানে না। তাই সে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া গঙ্গার তীরে গেল, গঙ্গার নির্ম্মল জল পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিল। গঙ্গার ধারেই পাটনা কলেজের বৃহৎ অট্টালিকা। সেই কলেজ-গৃহের বারান্দায় শত শত কলেজের ছেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সুরেশ তাহাদের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল—

"আমার বাবা বেঁচে থাক্‌লে, আজ আমিও বি-এ পাশ করে, এম-এ ক্লাশে পড়্‌তুম। আমার কি দুর্ভাগ্য ! যে সন্ন্যাসী আমাকে পালন করে-ছিলেন, তিনিও যদি বেঁচে থাক্‌তেন, তা হলে তাঁর কাছে ধর্ম্মশিক্ষা পেয়ে ঈশ্বরকে কত ভাল করে জান্‌তে পারতুম। সন্ন্যাসী বল্‌তেন, 'ঈশ্বরকে ভালবেসে তাঁর প্রিয় হতে পার্‌লে যে সুখ, তেমন সুখ আর কিছুতেই নেই।' হে আমার ঈশ্বর, আমার ত লেখাপড়া শিখে সুখী হবার আর

আশা নেই, আমি কি তোমাকে ভালবেসে, তোমার ভালবাসা পেয়ে সুখী হতে পারি নে ?”

সুরেশ একটু পরে আবার মনে মনে বলিল—“ঈশ্বরের করুণা হলে কি না হয় ? তাঁর দয়া হলে, এখনো আমার লেখাপড়া শিখে সুখী হবার আশা আছে। আমি আপনাকে এত হীন মনে করি কেন ? ঈশ্বর আমার শরীরে আশ্চর্য্য পরিশ্রমের শক্তি দিয়েছেন, আমি কুলিমজুর হয়ে অর্থ উপার্জ্জন করে কেন লেখাপড়া করিনে ? শুনেছি, আমেরিকার কত অসহায় ছেলে রাস্তা পরিষ্কার করে, পয়সা রোজগার করে লেখাপড়া শেখে। আমার প্রতিজ্ঞা, পড়াশুনা আমি করবই, তা যেমন করেই হো'ক। আমি আজ থেকে এই পাটনা সহরেই মুটের কাজ করব। মানুষের বোঝা বয়ে পয়সা উপার্জ্জন করতে আমার লজ্জা কি ? তাতে আর আমার কারো অধীন হতে হবে না। স্কুলে যাবার সময়ে স্কুলে যাব, অন্য সময় মুটের কাজ করব। ঈশ্বর আমাকে এমন শক্তি দিয়েছেন, অন্য ছেলেরা একদিন পরিশ্রম করে যে পড়া তৈরী করে, আমি তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করেই তা করতে পারি। আমি কাল থেকেই স্কুলে ভর্ত্তি হব, আর এখনি বাজারে গিয়ে মুটের কাজে লেগে যাব।”

“সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়”—এ কথা বড়ই সত্য। সুরেশ মহৎ সংকল্প করিয়া বাজারে গেল ; সে দেখিল, একটি ভদ্রলোক দোকানে চাউল কিনিতেছেন। সুরেশ তাঁহাকে কহিল, “আমি বড় অসহায়, আমার কেহ নেই, দয়া করে যদি অনুমতি করেন, তা হলে আমিই মুটে হয়ে এই চালের বোঝা মাথায় নিয়ে আপনার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিব।”

ভদ্রলোকটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি সুরেশের সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেশ সংক্ষেপে আপনার জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিল। অধ্যাপক কহিলেন, “তোমাকে আর বোঝা বইতে হবে না, আমার বাড়ীতে চল, সেখানে থেকে পড়াশুনা করবে।”



সার্কাসের সিংহ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে

-৭৫ পৃষ্ঠা।

সুরেশ। অমার মাথায় বোঝা তুলে দিতে যদি আপনার কষ্ট হয়, তা হলে আমাকে আপনার রান্নাবান্নার বামুনঠাকুর করে রাখুন ; নিজের মুখেই বল্‌ছি, আমি চমৎকার রান্না কর্‌তে পারি।"

"এখন ত আমার সঙ্গে এস, তার পরে যা হয়, ভেবে দেখা যাবে।" অধ্যাপক এই কথা বলিয়া সুরেশকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সুরেশ দুই তিন দিন অধ্যাপকের বাড়ীতে বাস করিল। অধ্যাপক আর তাঁহার স্ত্রী সুরেশের ভাল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অধ্যাপকের স্ত্রী কহিলেন, "আচ্ছা সুরেশ, তুমি যদি খুব ভাল রান্না কর্‌তে পার, তা হলে প্রত্যেক রবিবার মাংস ও মিষ্টান্ন তৈরী করে আমাদের খাওয়াবে। তা ছাড়া অন্য সময় আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা কর্‌বে।"

সুরেশ অধ্যাপক এবং তাঁহার স্ত্রীর সুমধুর স্নেহে ও সুমিষ্ট ব্যবহারে যথার্থই সুখী হইল। সে খুব মন দিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিল।

সুরেশ তাহার পরে এন্‌ট্রেন্‌শ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল এবং কুড়ি টাকা মাসিক বৃত্তি পাইল।

কিন্তু হায়, এই আনন্দের মধ্যেও আবার দুঃখ বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া সুরেশের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ পরীক্ষার সংবাদ পাইয়া দানাপুরে একটি বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেই সময়ে এক সার্কাসওয়ালা সাহেব দলবল লইয়া সেখানে আসিয়া আড্ডা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁর দুই দিকে প্রকাণ্ড সিংহ লইয়া খেলা দেখাইতেন। সেইজন্য বিস্তর লোক সার্কাস দেখিতে আসিত। একদিন সার্কাসওয়ালাদের অসাবধানতায় এক সিংহ লোহার খাঁচা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাহার দুর্জ্জয় শক্তি কে দেখে? সে ছুটিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় আসিয়া পড়িল এবং গর্জ্জন করিতে করিতে, যাহাকে সাম্‌নে পাইল, তাহাকেই কামড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। "ঐ সিংহ আস্‌ছে, ঐ সিংহ আস্‌ছে" বলিয়া লোকেরা ভয়ে ছুটাছুটি

আরম্ভ করিল। সার্কাসের সাহেব বন্দুক ও তলোয়ার লইয়া সিংহের পশ্চাতে ছুটিল।

সুরেশ এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিল, "আমি মর্‌লে কারই বা কি লোকসান হবে ? আমিই কেন সিংহটাকে মারিবার চেষ্টা করি না ?" সুরেশ সার্কাসওয়ালা সাহেবের নিকট হইতে তলোয়ার চাহিয়া লইল এবং সিংহের পিছনে পিছনে ছুটিল। সুরেশের আশ্চর্য্য দৌড়াইবার শক্তি। সে সিংহের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল। বৃহৎ সিংহ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাহার উপরে পড়িল। সিংহের মাথায় তলোয়ারের আঘাত করিয়াই সুরেশ অজ্ঞান হইল। ইতিমধ্যে দানাপুরের ব্যারাকের কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য বাহির হইয়া সিংহকে গুলি করিল। সিংহ মরিল বটে, কিন্তু সুরেশকেও অর্দ্ধেক মারিয়া গেল। তথনই সুরেশকে দানাপুরের হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ রাস্তার লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, এজন্য দানাপুরের সাহেব ডাক্তার স্বয়ং তাহার চিকিৎসা করিতেছেন। পাটনার স্কুলের ছেলেরা সুরেশের সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারা দানাপুরে আসিয়া সুরেশের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার গায়ের ঘা শুকাইল না, সে রক্তহীন ও শীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার যখন আর বাঁচিবার আশা রহিল না, তখন কি জানি কি ভাবিয়া সে দার্জ্জিলিঙ্গে সরলার পিতা নগেন্দ্রনাথের নিকট একটি টেলিগ্রাম করিল।

নগেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। হায়, তবে কি মৃত্যুর পথেই ভায়ের সঙ্গে বোনের পরিচয় হইবে? নগেন্দ্রনাথ সরলার কাছে কোন কথাই খুলিয়া বলিলেন না। তিনি কহিলেন, "সরলা, খবর পেয়েছি, সুরেশ দানাপুরে আছে। আজকের গাড়ীতেই তোমাকে নিয়ে দানাপুর যাত্রা করব।"

স্বাভাবিক রক্তের সম্পর্কের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ! যে কমলাদেবী সরলাকে এতদিন মায়ের মতন মানুষ করিয়াছেন, আজ সরলাকে চোখের আড়াল করিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সরলা যে দানাপুরে গিয়া ভাইকে দেখিতে পাইবে, সেই কল্পনায় তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল। তার পরে সরলা যখন দানাপুরে যাত্রা করিবে, তখন কমলাদেবী চোখের জলে ভাসিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, আমার কথা ভুলো না, আমার কাছে ফিরে এস।"

সরলা কহিল, "তোমায় কি আমি ভুলতে পারি? আজ যদি আমার নিজের মা এসে উপস্থিত হন, আর আমায় নিয়ে যেতে চান, তা হলেও

আমি বল্‌ব, আপনি আমার নিজের মা সত্য, কিন্তু আমি ত আপনার কাছে থাকি নি, যিনি আমাকে ছেলেবেলা হতে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব ?”

নগেন্দ্রনাথ সরলাকে সঙ্গে লইয়া রেলগাড়ীতে উঠিলেন। রাত্রে সরলার চোখে আর ঘুম কোথায় ? সে মনে মনে শুধুই সুখের কল্পনা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, “আমি দানাপুরে গিয়ে যখন দাদাকে প্রণাম কর্‌ব, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে আমার পানে চেয়ে থাক্‌বেন। আমি হেসে বল্‌ব, ‘বলুন ত আমি কে ?’ দাদা বল্‌বেন, ‘তুমি সরলা।’ আমি বল্‌ব, ‘কই আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন ? আমি ত সরলা নই, আমি সে আপনার বোন সুহাসিনী। দেখুন ত কি আশ্চর্য্য ! আমি যমের পুরী হতে ফিরে এসেছি।’ দাদা আমার কথা শুনে হয় ত মনে কর্‌বেন, তিনি জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। আমি তাঁর মনের কথা বুঝ্‌তে পেরে বল্‌ব, ‘বাঃ, আপনি বুঝি মনে কর্‌ছেন জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছেন ? স্বপ্ন কেন ? এ যে সবই সত্য’।”

“তার পরে দাদার কাছে যখন সকল কথা খুলে বল্‌ব, তখন পুলকে তাঁর সুন্দর মুখখানি আরো সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে, আমার পানে চেয়ে তাঁর সমস্ত হৃদয় ঈশ্বরের কাছে লুটিয়ে পড়্‌বে ; তিনি সুখের আবেশে শুধুই ঈশ্বরের করুণা স্মরণ কর্‌বেন।”

সরলা এই রকম কত কি কল্পনা করিয়া দানাপুরে আসিয়া পৌঁছিল এবং সুরেশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সরলাকে দেখিয়া সুরেশের মৃত্যুশয্যা যেন সুখের কুসুম শয্যায় পরিণত হইল। সুরেশ দুখানি হাত যোড় করিয়া কহিল, “করুণাময় ঈশ্বর, তোমারই করুণায় মৃত্যুকালে সরলাকে দেখ্‌তে পেলেম। আমার মনে যে সুখ আর ধরে না।”

কিন্তু হায়, সরলার সকল কল্পনা মিথ্যা হইয়া গেল, সে সুরেশকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং কহিল, “দাদা, প্রাণভরা আনন্দ নিয়ে

তোমাকে বল্‌তে এসেছিলুম, আমিই তোমার স্নেহের বোন সুহাসিনী। বড় আশা করেছিলুম, বহুদিনের পরে অতি আশ্চর্য্য ভাবে ভায়ের সঙ্গে বোনের মিলন হবে। হায়, এ যে চিরজীবনের মতন বিচ্ছেদ। বল দাদা, তুমি কি যথার্থই আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?”

নগেন্দ্রনাথ সুরেশকে সকল রহস্য কথা বুঝাইয়া বলিলেন। সুরেশ কহিল—“সরলা, তুমি আমারই বোন সুহাসিনী? তবে এস ত, ভাল করে তোমার মুখখানি একবার দেখি। যে দিন প্রথমে তোমাকে দার্জ্জিলিঙে দেখেছিলুম, সেই দিনই আমার মনের ভিতর হতে কে যেন বলেছিলেন—‘এ যে তোমারই বোন।’ আজ বিশ্বাস হচ্ছে, মনের ভিতরের সেই ঈশ্বরের বাণী। ঈশ্বরই করুণা করে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। সরলা, তুমি যদি আমার আর দুটি বোনকেও সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে পার্‌তে, তবে তাদের দেখে আমার কতই আনন্দ হত।”

সুরেশ কথা বলিতে বলিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। একটু নীরব থাকিয়া সে কহিল—“সরলা, তুমি শুনলে অবাক্ হবে, আমি মর্‌ব এই কথা ভেবে বড়ই খুসী হয়েছিলুম। আমার মনে হয়েছিল, ঈশ্বরের কাছে গিয়ে আমার বাবাকে ও মাকে দেখ্‌তে পাব; আমায় দুটি বোনের সঙ্গে একটি মধুর স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কিন্তু এখন যে আমার বেঁচে থাকৃতে ইচ্ছা হচ্ছে। দয়াময় ঈশ্বর, তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পার না? আমি অনেক দিন ধরে সুখ কাকে বলে তা ত জানি নে; আজ মনে হচ্ছে আমার তিনটি বোনের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাদের ভালবাসা পেয়ে তাদের স্নেহ দিয়ে এবং তাদের জন্য কিছু করে এ জীবনকে সার্থক কর্‌তে পার্‌ব।”

সুরেশ প্রায় পনের মিনিট নীরবে সরলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পরে কহিল “সরলা আমার চোখের দৃষ্টি শক্তি চলে

যাচ্ছে। একটু পরে তোমার মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব না। আমার জিভ আড়ষ্ট হয়ে পড়্‌ছে, আর কথা বল্‌তেও পারব না। আমার প্রাণ যখন বের হয়ে চলে যাবে, তখন তোমার মধুর কণ্ঠে ঈশ্বরের নামের একটি গান করো। গান্‌টি শুন্‌তে শুন্‌তে আমি বিশ্বজননীর কাছে চলে যাব।”

সরলার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে তাহার কান্না বুকের ভিতরে চাপিয়া রাখিয়া, শুধুই প্রার্থনা করিতে লাগিল—“দয়াময় ঈশ্বর, তুমি দয়া করে আমার দাদাকে বাঁচাও।”

নগেন্দ্রনাথের মহৎ হৃদয়। তাই তিনি বিস্তর টাকা খরচ করিয়া খুব বড় ডাক্তার আনাইলেন। সরলার দিনরাত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও শুশ্রূষার জন্যই যেন সুরেশের অবস্থা ভাল হইয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ এক মাসের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিল। নগেন্দ্রনাথ সুরেশ ও সরলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং গমন করিলেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করায় সুরেশের শরীর সুস্থ ও সবল হইল।

নগেন্দ্রনাথ সুরেশকে কহিলেন—“সরলাকে কন্যারূপে পেয়ে আমরা বড়ই সুখী হয়েছিলুম। কিন্তু তবুও মনে হত, আমাদের একটি ছেলে থাক্‌লে আর কোনই অভাব থাক্‌ত না। ঈশ্বর দয়া করে আজ তোমাকেই পুত্র রূপে কাছে নিয়ে এলেন। আমার সমস্ত টাকাকড়ি ও বিষয় সম্পত্তি তোমাদেরই লিখে দিয়ে যাব। তোমরা লেখা পড়া শিখে ঈশ্বরের করুণায় চিরদিন সুখে থাক।”

—*—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ ও সরলা দুজনেরই নির্ম্মলা ও সরযূকে কাছে পাইবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সুরেশ 'বাঁডন ষ্ট্রীটের' সেই রাক্ষুসী গিন্নির হাত হইতে দুইটি বোনকে উদ্ধার করিবার জন্য কলিকাতায় গেল। কিন্তু কোথায় নির্ম্মলা ও সরযূ? তাহারা ত আর কলিকাতায় নাই, গিন্নি তাহাদের লইয়া স্বামীর কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর কর্ম্মস্থান আসামের শেষ সীমায় একটি চা-বাগানে। সুরেশ সেই চা-বাগানে যাইবার জন্য আসামে যাত্রা করিল।

আসামের রেলের দুই পাশে ছোট বড় পাহাড়, ঝরণা এবং ভীষণাকৃতি বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে, সুরেশ একটি চা-বাগানে উপস্থিত হইল। 'বাঁডন ষ্ট্রীটের' গিন্নির স্বামী বলাই বাবু সেখানকার বড় একজন কর্ম্মচারী। সুরেশ তাঁহার বাসার কাছে গিয়া দেখিতে পাইল, মলিন কাপড় পরা সুন্দরী একটি বালিকাকে গিন্নি একখানা কাঠের চেলা দিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে মারিতেছেন, আর বলিতেছেন—"আমায় না ব'লে তারিণী বাবুর বাসায় গিয়েছিস্ এখন তার মজাটা দেখ্ দেখি। মেরে আজ তোর হাড় ভেঙ্গে দেব, তারিণী বাবুর স্ত্রী এসে ঠেকায়ে রাখুক দেখি।"

তারিণী বাবু চা-বাগানের একটি ছোট কেরাণী। তাঁর স্ত্রী দুঃখিনী সরযূকে বড় ভালবাসেন, কাছে ডাকিয়া খাবার দেন, আদর যত্ন করেন। গিন্নির তা সহ্য হয় না। আজ সরযূ তারিণী বাবুদের বাসায় গিয়াছে এবং তাঁর স্ত্রী সরযূকে একটু মিষ্টান্ন খাইতে দিয়াছেন, ইহাই সরযূর মস্ত বড় অপরাধ। সরযূকে মারিতে দেখিয়া নির্ম্মলা কহিল, "গিন্নি মা, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি অমন করে ওকে মারবেন না, ও যে মরে যাবে।"

গিন্নি। মরুক না, এখুনি মরুক. ওকে যম ভুলে আছে কেন? রাজ্যে এত মানুষের মরণ হয়, আর এই মেয়েটা মরে না কেন?

নির্ম্মলা। ওর ত কোন দোষ নেই, আমারই দোষ, আমিই ত সরযূকে তারিণী বাবুদের বাড়ী পাঠিয়েছিলুম। ওকে ছেড়ে দিয়ে আমাকেই ঐ কাঠের চেলা দিয়ে মারুন না।

সরযূ। না গিন্নি মা, আমাকেই মারুন; দিদিকে মারবেন না।

সুরেশ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এই দুটি মেয়ে তাঁহারই দুঃখিনী দুটি বোন। সুরেশ ভাবিতে লাগিল, "হায়, কিছুতেই দুঃখবিপদ আমাদের ত্যাগ করে যাবে না? আমরা কি চির অপরাধী হয়েই জন্মেছি? কেবল দুঃখ সয়ে, কেবল চোখের জল ফেলেই আমাদের এই সংসারে বাস করতে হবে?"

সুরেশ বলাই বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে বাবুটি আসিয়া সুরেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেশ তাঁহার কাছে আপনার জীবনের কাহিনী সমস্তই বলিল এবং কহিল—"আমি দার্জ্জিলিং হতে অনেক কষ্ট করে এই সুদূর আসামের চা-বাগানে এসেছি। আপনি দয়া করে দুটি বোনকে আমার হস্তে অর্পণ করলে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ অন্তরে আপনার উপকারের কথা স্মরণ করব।"

বলাই বাবু কহিলেন—"বাপু হে, তুমি জালজুয়াচুরি করবার আর জায়গা খুঁজে পেলে না? এসেছ আমার কাছে? আমি এই চা-বাগানে কুড়ি বৎসর হাজার কুলির চালক হয়ে মাথার চুল পাকাতে বসেছি। তুমি কি মনে করেছ, আমার চোখে ধূলা দিয়ে এই দুটি সুন্দরী মেয়েকে হাত করতে পারবে? তা ত কিছুতেই পারবে না। আমি বিশ্বাস করি না যে তুমি এই দুটি মেয়ের ভাই; কাজেই মেয়ে দুটিকে তোমার হাতে ছেড়ে দিতে পারব না।"

বলাই বাবু একটু পরে ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন, "আর আমার কথা

বলার সময় নেই, এখনি বড় সাহেবের কাছে যেতে হবে। তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও। জান ত এ চা-বাগান, এখানে যাকে তাকে ঢোক্‌বার অনুমতি দিই নে।"

সুরেশ। আমার বোন দুটিকে না দেখে কিছুতেই এই ঘর ছেড়ে যাব না।

বলাই বাবু। বটে! তুমি যাবে না? দরোয়ান্, এখনি এই ছোকরাকে গলাধাক্কা দিয়ে চা-বাগানের বাইরে রেখে এস।

দরোয়ান যথার্থই অপমান করিয়া সুরেশকে চা-বাগানের বাহিরে রাখিয়া আসিল। সুরেশ নিরুপায় হইয়া ডিব্রুগড় সহরে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পিতা যে বাড়ীতে বাস করিতেন, সে এক ধনবান্ মাড়োয়ারির বাড়ী। সেই বাড়ীতে এখন উমাচরণ বাবু উকিল বাস করেন। তিনি খুব ভদ্র এবং সহৃদয় ব্যক্তি। সুরেশ সেই উমাচরণ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া, আপনার পরিচয় প্রদান করিল। উমাচরণ বাবু তরুণ বয়সে বড়ই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুরেশের পিতার সুচিকিৎসায় তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, নৌকাডুবির সঙ্গে সুরেশদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। আজ সুরেশের মুখে তাহার সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তিনি সুরেশকে আদর-যত্ন করিয়া গৃহের ভিতরে লইয়া গেলেন। সুরেশদের বিস্তর দ্রব্যসামগ্রী ঐ বাড়ীর একটি ঘরে সাজানো ছিল। সুরেশ সেই সকল জিনিস দেখিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। সে যে চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িত, সেখানা ও তাহার পড়ার বইগুলি এখনো রহিয়াছে। এখনো তাহার পিতামাতার এবং তাহার নিজের ও দুই বোনের ফটো সেই ঘরখানির মধ্যেই আছে। ঐ সকল দেখিয়া সুরেশের মন একেবারে উদাস হইয়া গেল।

সুরেশ রাত্রে তাহাদের সেই প্রিয় ঘরখানির ভিতরে তাহারই পিতার

চৌকির উপরে শয়ন করিল। রাত দুপুরের সময় সে স্বপ্নে দেখিল, তাহার স্নেহময় পিতা তাহার অতি নিকটে। তিনি বলিলেন –

"আমার প্রিয়পুত্র, শুধু তোমাকে দেখার জন্যই পরকাল হতে এখানে এসেছি। তোমার নির্ম্মল চরিত্রের কথা জেনে আমি বড়ই সুখী। কিন্তু তোমার একটি কাজে আমি বড় ব্যথা পেয়েছি। তুমি ত জান, আমি জীবনে কখনো মানুষের অন্যায় অনুগ্রহ গ্রহণ করতে সম্মত হইনি। নগেন্দ্রনাথ নিজে উপার্জ্জন করে যে অর্থসঞ্চয় করেছেন, সেই অর্থে তিনি দেশের কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করবেন। তুমি কেন তাঁর টাকায় ধনী হতে চাও? তুমি আমার কথা শোন। তা হলেই তোমার কল্যাণ হবে এবং সুপুত্রের কার্য্যও করা হবে। তুমি আমার অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ কর। তুমি আমারই মতন সোনার খনির সন্ধানে হিমালয়ের দিকে যাত্রা কর। আমি সোনার খনির সন্ধান পাই নি, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই সন্ধান পাবে। সোনার খনি আবিষ্কার করতে পারলে দেশযোড়া তোমার নাম হবে, তখন কত টাকাই তোমার হাতে এসে পড়বে।"

সেই টাকায় তুমি নিজে সুখী হয়ে লক্ষ লোকের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করতে পারবে। সেই সময়ে বলাই বাবুর মতন মানুষ নির্ম্মলা ও সরযূকে আপনি নিয়ে এসে তোমার পায়ের কাছে রেখে যাবে। তুমি কাল সকালেই সোনার খনির সন্ধানে যাত্রা কর।"

সুরেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে মনে মনে কহিল, "মানুষ স্বপ্নকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, আমার ত সত্য বলেই মনে হচ্চে। আমার পিতা স্বর্গ হতে এসে, আমার যা করা দরকার, সেই কথাই বলে গেলেন। আমি কি পিতার আদেশ অমান্য করতে পারি?"

সুরেশ নগেন্দ্রনাথ ও সরলাকে দুখানি চিঠি লিখিয়া সোনার খনির সন্ধানে হিমালয় পাহাড়ের দিকে চলিল। সরলা চিঠি পড়িয়া শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল,—"নিষ্ঠুর মৃত্যুর সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে, তার কঠিন

হস্ত হতে দাদাকে রক্ষা করেছিলুম। এখন আবার তিনি একটা মিথ্যা স্বপ্নকেই সত্য মনে করে সোনার খনির সন্ধানে চল্লেন? বাবা ত এই খনির সন্ধানে গিয়েই আর ফির্‌তে পার্‌লেন না, দাদাও আর ফিরে আস্‌তে পারবেন কিনা তা কে বল্‌বে? হায়, অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখের পরে সবে কয়েকটি দিন মাত্র দুই ভাই বোন স্নেহসূত্রে বাঁধা পড়তেছিলুম, আজ সেই সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল? বলে দাও ঈশ্বর, এমন কেন হল?"

—০—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ সোনার খনির সন্ধানে বাহির হইয়া দিনের পরে দিন চলিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সে দেখিল, তাহার সম্মুখেই হিমালয় পর্ব্বত যেন আকাশে মাথা ঠেকাইয়া, সমস্ত দেশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরেশ সেই পাহাড়ের উপরে উঠিতে প্রবৃত্ত হইল। চারিদিকে কি ভীষণ জঙ্গল! কত জানোয়ার সেই জঙ্গলে বাস করে তাহা কে বলিবে? সুরেশকে সোনার খনির নেশায় ধরিয়াছিল, তাই সে মরণ-বাঁচন তুচ্ছ করিয়া এক পাহাড়ের উপর হইতে আর এক পাহাড়ের উপরে এবং এক জঙ্গল হইতে আর এক জঙ্গলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুরেশ চলিতে চলিতে এক অসভ্যদের দেশে উপস্থিত হইল। তাহার সম্মুখেই কি ভয়ানক দৃশ্য! সেখানে ছোট ছোট দুইটি অসভ্য জাতির মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। সুরেশ পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়া সেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। এক এক দলে প্রায় ছয় সাত শত লোক তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। কি চমৎকার তাহাদের তীর নিক্ষেপ! চোখের পলকে শত শত তীরন্দাজ ধনুক হইতে বিষমাখানো তীর শত্রুদের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিতেছে। সেই তীরের আঘাতেই অনেক লোক পাহাড়ের উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

কয়েক ঘণ্টা পরে এক দল অসভ্য যুদ্ধে হারিয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল। আর এক দল অসভ্য অনেকগুলি শত্রুকে বন্দী করিল। তাহার পরে অসভ্যের দল ভীষণ চীৎকার করিয়া বন্দীগুলিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। সুরেশ জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে কোন অসভ্যই দেখিতে পাইল না। অসভ্যগণ একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রত্যেকটি বন্দীর হাত পা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল।



দুই দল অসভ্য যুদ্ধ করিতেছে

—৮৬ পৃষ্ঠা

তাহারা দূর হইতে বন্দীদের গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়িবে, আর ঐ সকল হতভাগ্যেরা যাতনায় ছটফট করিয়া মারা যাইবে। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার সুরেশ কেমন করিয়া দেখিবে?

সুরেশ বন্দীদের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। সে খুব তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া অসভ্যদের সন্মুখে দাঁড়াইল। সুরেশ এখনো পাহাড়ীদের ভাষা ভুলিয়া যায় নাই। তাই সে অসভ্য ভাষায় কহিল—"তোমাদের কি মনে আছে, এই পাহাড়ে এক সন্ন্যাসী ছিলেন? তিনি তোমাদের বিস্তর উপকার করেছেন। এ দেশে এমন কোন্ অসভ্য রাজা ছিলেন, যিনি তাঁকে গুরু বলে মান্য করতেন না? সেই সন্ন্যাসীই আমাকে সন্তানের মতন মানুষ করেছেন। এখন তিনি পরলোকে। আমি আজ তাঁর নাম করে বল্‌ছি, তোমরা এই বন্দীদের নিদ্দয়রূপে হত্যা না করে বন্দী করে রাখ। হত্যা কর্‌লে এই কথা ইংরাজ রাজার কাণে যাবে। তা হলেই তোমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাক্‌বে না। তাঁরা বিচার করে তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।"

অসভ্যেরা উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে নিশ্চয়ই ইংরাজের গুপ্তচর? তোমাকেই আগে হত্যা করার দরকার।"

অসভ্যেরা সুরেশকে ধরিয়া একটি গাছের সঙ্গে বাঁধিল। তাহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া, গায়ে বিষাক্ত তীর ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য ধনুক হাতে লইল। সুরেশ চীৎকার করিয়া কহিল, "করুণাময় পরমেশ্বর, সকল বিপদ হতে তুমিই আমাকে রক্ষা করেছ, আজ তুমি ছাড়া আর কে আমাকে রক্ষা করবে? আমি তোমারই দয়া ভিক্ষা কর্‌ছি।"

এই সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনী আসিয়া সুরেশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত। তাঁহার পরণে গৈরিক বস্ত্র, হাতে দীর্ঘ ত্রিশূল। তিনি আকাশ কম্পিত করিয়া "জয় জগদীশ্বর" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অসভ্যের

দল ভয়ে ভীত হইয়া সন্ন্যাসিনীর পানে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসিনী তেজের সঙ্গে কহিলেন, "এখনি তোমরা এখান হতে ছুটে ঘরে চলে যাও, নইলে তোমাদের বিপদ ঘনিয়ে আস্‌তে আর বড় বেশী বিলম্ব হবে না।"

অসভ্যেরা এই সন্ন্যাসিনীকে স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে করে। তাই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া সকলেই প্রস্থান করিল। সন্ন্যাসিনী সুরেশের এবং বন্দী অসভ্যদের বাঁধন খুলিয়া দিলেন। বন্দীগণ পলাইয়া গেল। সুরেশ সন্ন্যাসিনীর স্নেহমাখা মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "মা, আপনি কে? স্বয়ং ঈশ্বরই কি আমাকে বাঁচাবার জন্য, আপনাকে এই পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন—"এস পুত্র, নিকটেই আমার মন্দির। সেই মন্দিরে এসে বিশ্রাম কর।"

সন্ন্যাসিনীর সুরেশকে সঙ্গে লইয়া একটি মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সুরেশ চমকিয়া উঠিল! এই মন্দিরেই ত সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাস করিত। এখনো ত মন্দিরের গায়ে তাহার হস্তাক্ষর রহিয়াছে; ঐ যে লেখা আছে—"সুরেশ—সুহাসিনী—নির্ম্মলা" সন্ন্যাসিনীই এখন এই মন্দিরে বাস করেন। তিনি সুরেশকে দুধ আর ফল খাইতে দিলেন। উহা খাইয়া সে একটু সুস্থ হইল। তখন সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "তুমি কে? কোথা হতে কেমন করে এই পাহাড়ে এলে?"

সুরেশ। মা, আমি একদিন পিতৃমাতৃহীন হয়ে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই মন্দিরেই ছিলুম। আপনি কেমন করে এখানে এলেন? আপনার সব কথা শুন্‌বার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসিনী। আমি সন্ন্যাসিনী, তবু তোমার পানে চেয়ে স্নেহ যেন উথ্‌লে উঠ্‌ছে; মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে যেন কত কালের কি একটা সম্পর্ক আছে। আমি তোমাকে খুব সংক্ষেপে আমার জীবনের কাহিনী

বল্‌ছি। আমার স্বামী ডিব্রুগড়ের বড় ডাক্তার ছিলেন। তিনি নৌকায় আমাকে এবং সন্তানদের নিয়ে সোনার খনির সন্ধানে যাচ্ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদীতে ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হল, তাই আমাদের নৌকা ডুবে গেল। আর সকলেই জলে ডুবে মর্‌লেন, শুধু আমিই কোলের দুটি মেয়ে নিয়ে বেঁচে রইলুম। তার পরে একটি অসভ্যদের রাজ্যে আশ্রয় পাওয়া গেল। সেখানে দুঃখে দুশ্চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। আমি দুটি কন্যাকে সেই পাহাড়ে ফেলে, পাগল হয়ে, এক রাত্রে জঙ্গলে ঢুকে পড়্‌লুম। জানি না, কেন বনের জানোয়ারের আমার রক্ত খেতে ইচ্ছা হল না। আমি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এক অসভ্য জাতির রাজ্যে উপস্থিত হলাম। তারা আমাকে উন্মাদ দেখে বেঁধে রাখ্‌লো। সেইখানেই এক বৎসর কেটে গেল। অবশেষে কোথা হতে এক সন্ন্যাসী এসে ওষুধ দিলেন তাতেই আমার অসুখ ভাল হয়ে গেল। আমি অভাগিনী, আমার কুটীরে ফিরে এসে দুটি মেয়েকে আর দেখ্‌তে পেলেম না। সেই হতেই আমি মনের দুঃখে সন্ন্যাসিনী। এই মন্দিরে থেকেই ঈশ্বরের নাম করি।”

সুরেশ আর থাকিতে পারিল না, সে সন্ন্যাসিনীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল এবং কহিল, “স্নেহময়ী মা আমার, আমি সোনার খনির সন্ধানে বের হয়েছিলুম, কিন্তু তোমাকে পেয়ে যা লাভ কর্‌লুম, তার কাছে শত সোনার খনি অতি তুচ্ছ সামগ্রী। রাখ মা, একবার তোমার স্নেহ হস্ত আমার বুকের উপর রাখ, জীবনে যত দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, তার স্মৃতি আজ হৃদয় হতে মুছে যাক। রাখ মা, তোমার কল্যাণ হস্ত একবার আমার মাথার উপরে রেখে আশীর্ব্বাদ কর। আমার জন্ম আজ সার্থক হো’ক।”

সন্ন্যাসিনী বুঝিতে পারিলেন, এই সুরেশই তাঁহার প্রাণাধিক সন্তান। তাই তিনি আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, সুরেশের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, “পুত্র আমার, পরম স্নেহের পাত্র আমার, ঈশ্বর আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে, তোমাকে কি স্বর্গ হতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন?”

সুরেশ। শুধু যে আমাকে দেখ্‌তে পেলে, তা নয়, সুহাসিনী, নির্ম্মলা, সরযূ সবাইকেই দেখ্‌তে পাবে।

মা। বল কি সুরেশ? তারা কি বেঁচে আছে? তুমি কোথায় তাদের দেখ্‌লে? কেমন করে তাদের কথা জান্‌লে?

সুরেশ মাতার কাছে আপনার এবং সরলা, নির্ম্মলা ও সরযূর সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিল। তখন মাতার প্রাণে যে অনুপম আনন্দ, তাহা কে বর্ণনা করিবে?

সুরেশ মাতাকে সঙ্গে লইয়া মনের আনন্দে ডিব্রুগড় যাত্রা করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশের ছোট দুটি বোন নির্ম্মলা ও সরযূ যে চা বাগানের বড় বাবু বলাই চাটুয্যের বাসায় আছে, সে কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। বলাই বাবুর কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে একটি বিবাহ। সে জন্য তিনি সপরিবারে গরুর গাড়ীতে ডিব্রুগড় যাইতেছেন। ডিব্রুগড় হইতে ষ্টিমারে গোয়ালন্দ, আবার সেখান হইতে রেলগাড়ীতে কলিকাতা যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে নির্ম্মলা ও সরযূ কলিকাতা যাইতেছে। এজন্য দুটি বোনেরই মনে আনন্দ আর ধরে না। তাহারা ভাবিতেছে, কলিকাতা গেলেই মেয়েদের বোর্ডিংয়ে, সরলার সঙ্গে আবার দেখা হইবে, আবার তাহার ভালবাসা পাইবে।

বলাই বাবুর গরুর গাড়ী ভয়ানক জঙ্গলের পথ দিয়া যাইতেছিল। তিনি সঙ্গে যে খাবার জল আনিয়াছিলেন, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে; তাই সঙ্গের ছেলেটি জল পিপাসায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। একটু দূরেই একটা ঝরণা দেখিতে পাওয়া গেল। তাহার জল অতি নির্ম্মল। বলাইবাবু ঝরণা দেখিয়াই জল নেবার জন্য গাড়ী থামাইলেন। কিন্তু কে জল আনিতে যাইবে? এই জঙ্গলে বিস্তর বাঘ, রাত্রে ভয়ে কোন গরুর গাড়ী এই পথ দিয়া চলে না। বলাইবাবু নিজে বাঘের ভয়ে গাড়ী হইতে নামিলেন না; গাড়োয়ান জাতিতে বড় ছোট, তাই সে যে জল ছুঁইবে, গৃহিণী তাঁর ছেলেকে তাহা খাওয়াইবেন না। কাজেই তিনি হুকুম করিলেন—"নির্ম্মলা, তুই এই ছোট কল্‌সীটি নিয়ে ঝরণার কাছে যা, তাড়াতাড়ি কল্‌সীতে জল ভরেই গাড়ীর কাছে ছুটে আসিস্।"

ভয়ে নির্ম্মলার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু গিন্নির হুকুমের মত কাজ না করিলে কি আর রক্ষা আছে? কাজেই সে একটি বার ছোট বোন

সরযূর মুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া, জল আনিতে চলিল। সরযূ কহিল, "দিদি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

গিন্নি মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "কোথায় যাবে? বাঘের মুখে?" সরযূর আর কথা কহিতে সাহস হইল না, সে দিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নির্ম্মলা ঝরণার কাছে গিয়া যখন কলসীতে জল ভরিল, তখনই এক বাঘিনী বিকট গর্জ্জন করিয়া, সঙ্গে বাচ্চা লইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে জঙ্গল হইতে বাহির হইল। গাড়ীর দুই গরু দেখিতে ত প্রকাণ্ড কিন্তু এমনই ভয় যে, একটিবার বাঘের পানে চাহিয়াই ছুটিয়া চলিল। আর কাহার সাধ্য সেই দুই গরুকে থামাইয়া রাখে? সরযূ "দিদি দিদি", বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সে কান্নায় গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল না। সে গরীবের ঐ গরু দুটিই সম্বল; বাঘ আসিয়া গরুর উপর লাফাইয়া পড়িলে, সে কেমন করিয়া গরু দুটিকে বাঁচাইবে? গাড়োয়ান গাড়ী খুব ছুটাইয়া চলিল, নির্ম্মলা ঝরণার কাছেই পড়িয়া রহিল। বলাই বাবু মনে করিলেন, যে প্রকাণ্ড বাঘ, আবার তার সঙ্গে একটি বাচ্চা; নিশ্চয়ই সে বাচ্চা লইয়া খাবার জন্য শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। বাঘের কাছে মানুষের রক্ত যেমন উপাদেয় খাদ্য, এমন আর কিছুই নয়, কাজেই বাঘিনী এবং তাহার বাচ্চা এতক্ষণে নির্ম্মলার তাজা রক্ত খাইয়া হাড় মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন গাড়ী ফিরাইয়া নির্ম্মলার কাছে গিয়া আর লাভ কি?

কিন্তু নির্ম্মলাকে স্বয়ং ঈশ্বরই রক্ষা করিলেন। সে, বাঘ বাহির হইয়াছে দেখিয়াই, সামনের পাহাড়ের এক গহ্বরে গিয়া লুকাইল এবং গহ্বরের মুখ পাথর দিয়া বন্ধ করিল। সামনের মানুষ পলাইয়া গেল দেখিয়া, বাঘিনী হরিণ খুঁজিতে খুঁজিতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। নির্ম্মলা অনেকক্ষণ পরে, সাহস করিয়া গহ্বরের বাহিরে আসিল, কিন্তু কোথায় গরুর গাড়ী? অসহায় বালিকা সেই জঙ্গলে পাগলের মতন ছুটাছুটি

করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে কয়েক জন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিবার জন্য সেই বনে আসিয়া পড়িল। নির্ম্মলাকে তাঁহারা একটি রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিল। দুঃখিনী বালিকা সেইখানে চোখের জলে ভাসিয়া বলিতে লাগিল—"সরযূ, তুমি কোথায়? তোমায় না দেখে আমি কেমন করে থাক্‌ব?"

একটি পরীর মতন সুন্দর বালিকাকে এই ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া, ষ্টেসনের লোকজন আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই তাহার কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। ঠিক্ এই সময়ে একখানি রেলগাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। সেই গাড়ীতেই সুরেশ এবং তাহার মা ডিব্রুগড় যাইতেছিলেন। সুরেশ গাড়ী হইতে নির্ম্মলাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে ত চা-বাগানের বলাই বাবুর বাড়ীতে ঢুকিয়া এই মেয়েটিকে দেখিয়াছিল। তাহার বোন ছাড়া এত দুঃখ আর কাহার হইতে পারে? আর কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে অসহায় অবস্থায় একটি ষ্টেসনে পড়িয়া কাঁদিতে পারে? সুরেশ গাড়ী হইতে নামিয়াই বালিকার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল—"তোমার নামই কি নির্ম্মলা? তোমরা দুই বোনেই কি চা-বাগানে বলাইবাবুর বাড়ীতে ছিলে? এখানে কেমন করে এলে? তোমার ছোট বোনটি কোথায়?"

নির্ম্মলা কহিল, "আমারই নাম নির্ম্মলা, আমিই বলাইবাবুর বাড়ীতে ছিলাম। তিনিই আমাকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে, আমার ছোট বোনটিকে নিয়ে ডিব্রুগড় গিয়েছেন।"

সুরেশের মা গাড়ীতে বসিয়া নির্ম্মলার সকল কথাই শুনিতেছিলেন। তিনি আর সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; তাড়াতাড়ি নির্ম্মলার কাছে আসিয়াই, সেই বার তের বৎসর বয়সের মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাকে কোলে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মা তাহার সমস্ত স্নেহই মেয়েটির প্রাণে ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, "নির্ম্মলা আমার,

দুঃখিনী কন্যা আমার, তুমি কি অভাগিনী মাকে চিন্‌তে পার? এস, এস, আমার প্রাণের ভিতরে এস, আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়ে যা'ক্।"

নির্ম্মলা অবাক্ হইয়া একবার মায়ের মুখের পানে, আর একবার সুরেশের মুখের পানে চাহিতে লাগিল। ষ্টেসনের মানুষগুলির কাছে সকলই যেন ভেল্কীবাজির মতন মনে হইল। মা নির্ম্মলাকে বলিলেন, "এই তোমার দাদা সুরেশ, আশ্চর্য্য ভাবে এর প্রাণ রক্ষা হয়েছে; এবং আশ্চর্য্য ভাবেই এর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে।"

নির্ম্মলা যে কি বলিবে, ভাষাই খুঁজিয়া পাইল না। সে অনেকক্ষণ মায়ের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কিন্তু সুরেশকে কেমন করিয়া চিনিবে? তাহার ত কোন কথাই সে মনে করিতে পারে না। তাহাদের নৌকা ডুবির সময়ে সে যে অতি ক্ষুদ্র একটি বালিকা ছিল।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর বালিকাকে মা নিজের হাতেই ফল ও মিষ্টান্ন খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু বোন সরযূর জন্য নির্ম্মলার চোখের জল ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল, "আমার সঙ্গে সরযূ যদি মাকে আর দাদাকে দেখ্‌তে পেত, তবে তার মন যে পুলকে পূর্ণ হয়ে যেত। কে বল্‌বে আর তার সঙ্গে দেখা হবে কি না?"

সুরেশ কহিল, "লক্ষ্মী বোন আমার, তুমি সরযূর জন্য কেঁদ না। তুমি কি বুঝ্‌তে পারছ না, আমাদের মস্তকে কেমন আশ্চর্য্যভাবে ঈশ্বরের করুণার ধারা নেমে এসেছে। তাঁর করুণা না হলে কি এইখানে মার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হত? বলাইবাবু সরযূকে নিয়ে নিশ্চয়ই আজ ডিব্রুগড় থাক্‌বেন। কাল ছাড়া ত তাঁর ষ্টিমার পাবার আর যো নেই। আমি আজ ডিব্রুগড় পৌঁছেই, যেমন করেই হো'ক না কেন, সরযূকে খুঁজে বের কর্‌বই।"

সুরেশের মাতা কহিলেন, "সরযূকে চোখের সাম্‌নে দেখে, প্রাণ

জুড়াবার জন্য আমারও মন আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ না হোক, কাল তাকে পাবই। এখন যে তুমি আমার সাম্‌নে রয়েছ, তোমার মুখে কি হাসি দেখ্‌তে পাব না? সেই তুমি যেমন মিষ্টি করে আমাকে 'মা' 'মা' বলে ডাক্‌তে, তেমনি কি আমায় মা বল্‌বে না? আমাকে বুঝি এখনো তোমার মা বলে বিশ্বাস হচ্ছে না?"

নির্ম্মলা। বিশ্বাস হবে না কেন মা? সরযূর জন্য আমার মনটা কেমন হয়ে গিয়েছে, সেই জন্যই আমি তোমাকে 'মা' বলে ডাক্‌তে পারি নি। আচ্ছা মা, সরযূর কথা কি তোমার মনে পড়ে? না, না, আমি কি কথা বল্‌ছি? তুমি সরযূকে ভুল্‌বে কি করে? সে যে সকলের চেয়েই ছোট। তবে তুমি তাকে দেখ্‌লে কিছুতেই চিন্‌তে পার্‌বে না। কেমন করে চিন্‌বে? তুমি যে তাকে একটুখানি রেখে চলে গিয়েছ।

মা। লক্ষ্মী মা আমার, তুমিই ত কত ছোট, বল ত কেমন করে বোনটিকে মানুষ কর্‌লে?

সুরেশ। মা, সে দুঃখের কাহিনী শুনলে পাষাণও গলে যায়।

মা। সুরেশ, তুমি বুঝি সবই সুহাসিনীর কাছে শুনেছ?

নির্ম্মলা। সুহাসিনী কে? আমার দিদি? তিনি কি বেঁচে আছেন? দাদা যে বেঁচে আছেন, তা সরলাদিদির মুখে শুনেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তোমার সুরেশ দাদার সঙ্গে দেখা হবে। তা দেখা ত আজ হ'ল। কিন্তু আমার বাবা আর দিদি মরে গেলেন কেন? তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আর সরযূ কাছে থাক্‌লে আজ কি সুখই হত!

সুরেশ। নির্ম্মলা, তোমার দিদির কথা কিছু মনে হয়?

নির্ম্মলা। কিছুই না। কেমন করে মনে হবে? আমার শুধু মার কথাই মনে ছিল। আপনার কথাও আমার মনে ছিল না। পাহাড়ে অসভ্যদের দেশে একটু বড় হয়ে মার কাছে শুধু আপনার আর দিদির গল্প শুনতাম।

সুরেশ। তাই বুঝি মাকে পেয়েই তুমি খুসী হয়েছ? আমাকে দেখে খুসী হও নি?

নির্ম্মলা। আপনাকে দেখে খুব খুসী হয়েছি। যে দিন কলকাতায় সরলা দিদি বল্লেন, আপনি বেঁচে আছেন, সেই দিন থেকে কতবার ইচ্ছা হয়েছে যে আপনাকে একবার দেখি। তা, কেমন ক'রে দেখ্‌ব? আপনি যে কোথায় আছেন, তা সরলাদিদিও জান্‌তেন না। তিনিও যে আপনাকে খুব ভালবাসেন। কতদিন আপনার কথা বল্‌তে বল্‌তে চোখের জল ফেল্‌তেন।

সুরেশ। সরলার কাছে শুনেছি, তোমরা তাঁকে খুবই ভালবাস।

নির্ম্মলা। আপনার সঙ্গে তাঁর কবে দেখা হল? তাঁর কাছেই বুঝি আমাদের সব কথা শুনেছেন?

সুরেশ। হাঁ, তারই কাছে আমি তোমাদের কথা সব শুনেছি। কিন্তু নির্ম্মলা, ডিব্রুগড় গিয়েই সরযূকে যখন তোমার কাছে নিয়ে আস্‌ব, যখন তোমরা দুটি বোন মিলিত হবে, যখন তোমাদের দুজনকে দেখে মা'র মনে আনন্দ আর ধর্‌বে না, তখন এমন একটা আশ্চর্য্য কথা বল্‌ব, যা শুনে তোমরা সুখে একেবারে ভেসে যাবে।

নির্ম্মলা। সে কথা এখনি বলুন না।

সুরেশ। না, তা এখন ত বল্‌ব না।

মা। নির্ম্মলা, তুমি ত দাদার সঙ্গেই কথা বল্‌ছ? আমার সঙ্গে মন খুলে কথা ত বল্‌ছ না? তবে বুঝি আমার চেয়ে দাদাকে বেশী ভাল-বাস্‌বে?

নির্ম্মলা। মা, তোমার চেয়ে দাদাকে কেমন করে বেশী ভালবাস্‌তে পার্‌ব? বড় হয়ে দাদাকে ত দেখ্‌তে পাই নি, তোমাকেই দেখেছি, তোমার কাছেই দাদার সব কথা শুনেছি। এখনো মনে পড়ে, দাদার কথা আর দিদির কথা বল্‌তে বল্‌তে তুমি চোখের জলে ভেসে যেতে।

মা। তখন তুমি যে কি করতে তা আমার পরিষ্কার মনে আছে। তুমি বলতে "মা, তুমি কেঁদ না, তোমার চোখের জল ত দেখ্‌তে পারিনে।" তার পরে আমার যখন অসুখ হল, তখন তুমি অতি ছোট মেয়ে হয়েও আমার যে রকম সেবা করতে, তা দেখে অবাক্ হয়ে যেতুম; মনে হত, তুমি আমার মেয়ে নও, কোন্ দেবলোক হতে যেন আমারই কাছে নেমে এসেছ।

নির্ম্মলা। মা, আপনি ত পাগল হয়ে রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের রেখে চলে গেলেন। তার পরে কেমন করে ভাল হলেন? ভাল হয়ে কোথায় ছিলেন? কেমন করেই বা দাদার সঙ্গে আপনার দেখা হল?

সুরেশের মা একটি একটি করিয়া আপনার সকল কথা বলিলেন। নির্ম্মলা কহিল—"মা, আপনি চলে যাবার পরে পাহাড়ের পুরুষ মেয়ে সকলেই আমাদের যে কত ভালবেসেছে, তা কেমন করে বলব? তারা নানা রকম খাবার জিনিষ এনে আমাদের দিত, আর বল্‌ত, তোমাদের মা নিশ্চয়ই আবার ফিরে আস্‌বেন। এখন ত দেখ্‌ছি পাহাড়ীদের কথাই সত্য হল, তোমাকেও ফিরে পেলুম, দাদার সঙ্গেও দেখা হল। ঈশ্বর করুন ডিব্রুগড় গিয়েই যেন সরযূকে কাছে পাই। তাকে না পেলে কোন সুখেই ত সুখী হতে পারব না।"

সুরেশ। পাহাড়ীদের কথার চেয়েও আমার কথা সত্য হবে। আজ না হো'ক, কাল যে সরযূকে কাছে পাবে, সে কথা আমি নিশ্চয় করেই বল্‌তে পারি। শুধু কি তাই, কিছুদিন পরে যে তোমাদের দিদিকেও দেখ্‌তে পাবে।

নির্ম্মলা। আপনার কথা শুনে আমার মন যে কি রকম কর্‌ছে, আমি তা ভাল করে বুঝতেই পার্‌ছি নে।

মা। সরযূ আমাকে দেখ্‌লে মোটেই চিন্‌তে পার্‌বে না।

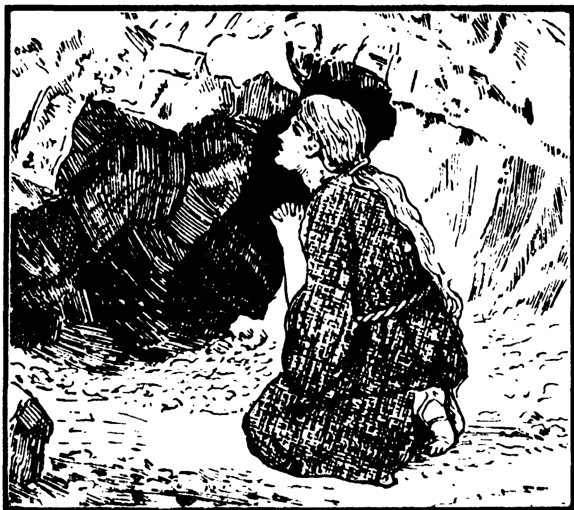
নির্ম্মলা। তা আর কেমন করে চিন্‌বে?

মা। তার চেহারা কি এখন তোমারই মতন হয়েছে?

নির্ম্মলা। আমি তা ঠিক বল্‌তে পারি নে। কিন্তু মা, হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতার মেয়েরা বল্‌ত, আমার চেহারা নাকি ঠিক সরলা দিদির মতন। মা, তুমি নিশ্চয়ই দাদার কাছে সরলা দিদির কথা শুনেছ।

সুরেশের মাতা ছেলেকে আর মেয়েকে লইয়া যতক্ষণ গাড়ীতে রহিলেন, ততক্ষণ কতই সুখদুঃখের কথা হইতে লাগিল। আজ যদি সরযূ তাঁহাদের কাছে থাকিত, তাহা হইলে না জানি এই মাতা পুত্র ও কন্যার মনে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

রেলগাড়ী ডিব্রুগড়ে আসিয়া পৌঁছিল। সুরেশ মাতাকে এবং নির্ম্মলাকে লইয়া তাঁহাদের আগের বাড়ীতেই উঠিলেন। সে বাড়ীতে যে এক উকিল বাবু বাস করিতেছিলেন, আমরা তা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উকিল বাবু অত্যন্ত সমাদর করিয়া সবাইকেই আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। সুরেশের মাতা একদিন দেবতার মতন স্বামী ও সন্তানদের লইয়া পরম সুখে এই বাড়ীতে বাস করিতেন। আজ একে একে কত সুখ ও দুঃখের কথাই তাঁহার মনে পড়িল। তিনি একটু বিশ্রাম করিয়া, কিছু জলখাবার খাইয়া বাড়ীটির চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা সরযূকে কাছে পাইবার জন্যই অস্থির হইয়া উঠিল। সুরেশ একটু বিশ্রাম করিয়াই বলাইবাবুর সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু সে দিন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সরযূর জন্য সমস্ত রাত্রি কাহারও আর ঘুম হইল না। সরযূকে যদি কোথাও খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে? সরযূকে আর পাওয়া যাইবে না, এই কথা ভাবিতেও যে সকলের হৃদয় শিহরিয়া উঠে।



নির্ম্মলা নির্জ্জনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে

—৯৮ পৃষ্ঠা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুরেশ খুব ভোরবেলায় উঠিয়াই ছোট বোন সরযূর খোঁজ করিতে বাহির হইল। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, হয়রাণ হইয়া, অবশেষে শুনিতে পাইল, বলাইবাবু সরযূকে লইয়া ষ্টিমার-ঘাটে চলিয়া গিয়াছেন। সুরেশ তখনি সহরের সব চেয়ে ভাল ঘোড়ার গাড়ীখানি ভাড়া করিয়া ষ্টিমার ঘাটে রওনা হইল। গাড়ীর প্রকাণ্ড দুই কালো ঘোড়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল। গাড়ী আধ ঘণ্টার মধ্যেই ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে ষ্টিমারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ইহার একটু আগেই বলাইবাবু তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ষ্টিমারে উঠিয়াছেন। কিন্তু সরযূ প্রকাণ্ড এক কাপড়ের বোঝা ঘাড়ে লইয়া, যখন সিঁড়ির তিনখানা কাঠের তক্তার উপর দিয়া ষ্টিমারে উঠিতেছিল তখন তক্তা নড়িয়া যাওয়ায় সে নদীর জলের ভিতরে পড়িয়া গিয়াছে। ষ্টিমারের নিকটেই পড়িয়াছিল, কিন্তু জলের এমন ভয়ানক স্রোত যে, দেখিতে দেখিতে সরযূ অনেক দূরে ভাসিয়া গেল। তাহাকে উঠাইবার জন্য খালাসীরা ছোট একখানি বোট ষ্টিমার হইতে জলে নামাইতে লাগিল, কিন্তু বোট কাছে যাইবার আগেই সুরেশ নদীর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সরযূকে লইয়া তীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলাইবাবুর কাপড়ের বোঝাটি জলের স্রোতে ভাসিয়াই চলিল। তাই তিনি রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ষ্টিমার হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং সরযূর গালে প্রকাণ্ড এক চড় মারিয়া কহিলেন, "হতভাগা মেয়ে, তুমি একথালা করে ভাত খাও, আর কাপড়ের বোঝাটা নিয়ে ষ্টিমারে উঠ্‌তে পার্‌লে না? আমার দশ টাকার কাপড় জলে ভেসে গেল; এস একবার ষ্টিমারে, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব না?"

বলাইবাবু মুখের কথা শেষ করিয়াই সরযূকে টানিয়া ষ্টিমারে লইয়া

যাইবার জন্য তাহার হাত ধরিলেন। কিন্তু সুরেশ আর সহিতে পারিল না, সে বলাইবাবুকে ধাক্কা মারিয়া পাঁচ হাত দূরে ঠেলিয়া দিল। তাহার পরে সরযূকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। বলাইবাবু গাড়ীর সামনে গিয়া যেমনি সুরেশকে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দেওয়া, অমনি তাহার পিঠে শপাং শপাং চাবুক। সুরেশ গাড়োয়ানের হাতের চাবুক কাড়িয়া লইয়া বলাই-বাবুকে মারিল। তিনি বুঝিলেন, এ তাঁহার চা-বাগান নয়, এখানে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দেওয়া চলিবে না। তাই তিনি চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন—"ও সারেং, তুমি চেয়ে দেখ, কোথাকার এক দস্যু আমাকে মেরে, আমার চাকরাণীর মেয়েকে জোর করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।"

ষ্টিমারের সারেং কহিল—"ষ্টিমারের ভিতরেই আমার অধিকার, বাহিরে নদীর তীরে কে কাকে মারে, কে কার মেয়ে কেড়ে নেয়, সে সব দেখ্‌বার ভার পুলিসের উপরে। আপনি থানায় গিয়ে পুলিসে খবর দিন, আমি এখনি জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছি।"

সুরেশ গাড়ী হাঁকাইয়া সহরে চলিল। বলাইবাবু ষ্টিমারে উঠিয়া পড়িলেন। ষ্টিমারের লোকেরা তাঁহাকে কহিল—"সে কি মশাই, আপনার কাপড়ের পুঁটলীটিও ভেসে গেল, মেয়েটিকেও দিনেদুপুরে দস্যুতে কেড়ে নিল? দস্যু কি কখনো দিনের বেলায় গাড়ী হাঁকিয়ে ষ্টিমার-ঘাটে আসে? আসল ব্যাপারটা কি বলুন ত আমরা শুনি!"

বলাইবাবু। ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। ঐ জোচ্চোর—যে মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে গেল, সে বলে মেয়েটি ওর ছোট বোন।

মানুষগুলি কহিল—"তা হলে ওটি আপনার চাকরাণীর মেয়ে নয়, ভদ্রলোকের মেয়ে!"

বলাইবাবুকে মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বলিতে হইল। ষ্টিমারের বাবুরা বলিলেন—"মশাই, আর আপনি বামুন বলে পরিচয় দিবেন না,

মেয়েটির উপরে মুচির মতন ব্যবহার করেছেন। তা, ঐ মেয়েটি আপনার হাত ছাড়া হয়ে রক্ষা পেয়েছে।”

গাড়ীর ভিতরে সরযূ অবাক্ হইয়া সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সুরেশের প্রাণ স্নেহে ভরিয়া উঠিল। সে সরযূর দুটি গালে হাত বুলাইয়া কহিল, “আমার প্রাণের বোন, আমিই যে তোমার দাদা, আমার নামই যে সুরেশ। আমার কথা ত তোমাদের সরলা দিদির কাছে শুনেছ। এখন আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি কোথায় তা জান? তোমার নির্ম্মলা দিদির কাছে।”

সরযূ সুরেশের মুখের পানেই চাহিয়া রহিল। তাহার পরে কাঁদিয়া ফেলিল। একটু শান্ত হইয়া কহিল—“দিদি যে বাঘের মুখে পড়ে মারা গিয়েছে।”

সুরেশ। কে বল্লে মারা গিয়েছে? তোমার দিদিকে বাঘে মার্‌তে পারে? ঈশ্বরই যে দয়া করে’ তাকে রক্ষা করেছেন। নির্ম্মলা বাঘের মুখ থেকে আমাদের কাছেই ফিরে এসেছে। আর একটু পরেই নির্ম্মলা দিদিকে দেখ্‌তে পাবে।

সরযূ। দিদিকে দেখ্‌তে পাব এ কথা কি সত্য?

সুরেশ। সত্যিই তাকে দেখ্‌তে পাবে। আমি যে তারও দাদা। সে বেঁচে না থাকলে আমি কি হাসিমুখে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে পারতুম্? আমি ত সরলার কাছে শুনেছি, দিদিকে না দেখ্‌লে তোমার মোটেই চলে না। কেমন করেই বা চলবে? দিদিই ত তোমাকে এত বড়টি করে তুলেছে। তা শুধু দিদিকে নয়, সেখানে আর’ একটি আশ্চর্য্য মানুষকে দেখ্‌তে পাবে। তাঁর ভালবাসা পেয়ে তুমি নির্ম্মলার চেয়েও তাঁকে বেশী ভালবাস্‌বে।

সরযূ। দিদির চেয়ে আমি কাকে বেশি ভালবাস্‌ব? তিনি কে? তিনি কি সরলা দিদি?

সুরেশ। সরলা ত কল্‌কাতায়। আচ্ছা সরযূ, আমরা যদি আমাদের মাকে দেখ্‌তে পেতুম, তা হলে কেমন হত ?

সরযূ আবার অবাক্ হইয়া সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সমস্ত ব্যাপার তাহার কাছে যেন কি রকম মনে হইতে লাগিল। সে কহিল, "মাকে কি আর দেখ্‌তে পাব ? তবে দিদি যখন মাকে মনে করে কাঁদতেন, তখন সরলা দিদি বল্‌তেন, তোমরা ঈশ্বরের কাছে বল, হে ঈশ্বর, আমাদের মাকে, দাদাকে আর সুহাসিনী দিদিকে যেন দেখ্‌তে পাই। তা হলেই ঈশ্বরের করুণায় সবাইকেই দেখ্‌তে পাব।"

সুরেশ। সে ত ঠিক্ কথা। সবাইকেই দেখ্‌তে পাবে।

গাড়ী সহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। সুরেশ এক দোকানের কাছে গাড়ী থামাইয়া সরযূর জন্য খুব সুন্দর কাপড় আর জামা কিনিল। এতক্ষণ সরযূ ভিজা কাপড় পরিয়াই গাড়ীতে বসিয়াছিল। বৃষ্টিতে কাপড় ভিজিলে এমন ত সে অনেক দিনই ভিজা কাপড় পরিয়া থাকে। তাই তাহার বেশি কষ্ট হয় নাই, কিন্তু সুরেশের বড় কষ্ট হইতেছিল। এইবার যখন সরযূ নূতন কাপড় পরিল এবং জামা জ্যাকেট গায় দিল, তখন তাহার সুন্দর চেহারা বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সুরেশ কহিল, "সরযূ, তুমি ত আমাকে কখনো দেখ নি, কেমন করে বুঝ্‌লে আমি তোমার দাদা ?"

সরযূ। আপনি যে বল্‌ছেন, আমার দাদা।

সুরেশ। তোমাকে ভুলায়ে কোথাও নেবার জন্য যদি মিছে কথা বলে থাকি ?

সরযূ। আপনি যে খুব ভাল। যারা ভাল, তারা ত মিছে বলে না।

সুরেশ। কেমন করে বুঝ্‌লে আমি খুব ভাল ?

সরযূ। আপনাকে দেখ্‌লেই যে বেশ ভাল লাগে।

সুরেশ সরযূকে নানা কথায় ভুলাইয়া বাসায় আসিয়া পৌছিল।

নির্ম্মলা সরযূকে দেখিয়াই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরে কহিল—"সরযূ, আমার লক্ষ্মী বোন, তোমাকে যে আবার দেখ্‌তে পাব, তা ত মনেই হয় নি। বল ত দুদিন আমায় না দেখে কেমন করে থাক্‌লে? খুব বুঝি কেঁদেছ?"

সরযূ আর কিছু বলিতে পারিল না, সে দিদির বুকে মুখ লুকাইয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। সুরেশের মাতা ধীরে কন্যার কাছে আসিলেন। নির্ম্মলা কহিল, "সরযূ চেয়ে দেখ, এই যে আমাদের মা। মাকে কি চিন্‌তে পার? আগে মাকে প্রণাম কর, তার পরে তাঁর কোলে যাও।"

সরযূ কিছুক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পরে মাকে প্রণাম করিল। মা তাহাকে কোলে করিয়া ঘরের ভিতরে গেলেন। প্রথমে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দয়াময় ঈশ্বর, আজ তোমাকে কি বলে আমি ধন্যবাদ করব? এই দুঃখিনীকেও তুমি যে এত ভালবাস, তা আমি ভাব্‌তেই পারি নি। তুমি আশ্চর্য্যভাবে আমার পুত্র কন্যাদের সঙ্গে মিলন করে দিলে! আমি যেন চিরদিনই তোমার এই দয়া মনে রেখে তোমাকে ভক্তি অর্পণ কর্‌তে পারি।"

মায়ের ভালবাসার মতন আর কি কিছু আছে? এই জগতে এমন আর কিছুই নাই। সরযূ নির্ম্মলার ও সরলার কাছে কতই ত ভালবাসা পেয়েছিল, কিন্তু আজ মায়ের ভালবাসায়, মায়ের স্নেহভরা কথায়, মায়ের অঙ্গের সুবিমল স্পর্শে যাহা পাইল, ছোট মেয়ে বলিয়া তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে সুখও যে আর ধরিতেছে না। এমন সুখ সে ত আর কিছুতেই পায় নাই।

নির্ম্মলা কহিল, "সরযূ, আমি যখন বল্‌তুম, মাকে দেখ্‌তে পেলে, আর কিছুই পেতে চাই নে তখন ত তুমি বল্‌তে আমারও মাকে দেখ্‌তেই

বড় ইচ্ছা হয়। এখন তুমি মার কোলেই বসে আছ, মা তোমাকে কত ভালবাসা দিচ্ছেন। কই? তুমি ত মাকে একবার মা বলে ডাক্‌তেও পারলে না? মাকে মা বলে ডাক না, তা হলে মা বড়ই খুসী হবেন।"

সরযূ। মা, আপনি কার কাছে আমাদের কথা শুন্‌লেন? কেমন করে এখানে এলেন?

মা। মনে কর ঈশ্বরের কাছেই তোমাদের কথা শুনেছি, তাঁর করুণায়ই এখানে এসেছি। ঐ যে খাবার আস্‌ছে। লক্ষ্মী মা, এখনোত তুমি কিছু খাও নি, আজ আমিই এই লুচি, বেগুনভাজা মিষ্টান্ন তোমাদের মুখে তুলে দেব। কেমন, তাতে তোমার এই খাবারগুলি খুব ভাল লাগ্‌বে না?

নির্ম্মলা। বল না, মার হাতে খেলে তা আবার ভাল লাগবে না?

সুরেশ কহিল, "মা, আজ এই মিলনের, এই সুখের দিনে, আমি নিজেই বাজারে যাব। ভাল ভাল জিনিষ কিন্‌ব, তার পরে নিজের হাতেই নানা রকম রান্না করে সবাইকে খাওয়াবো। আমি যে ছেলেবেলা থেকে বামুন ঠাকুরের কাজ করে করে চমৎকার রান্না কর্‌তে শিখেছি।"

মা। তুমি যে দুঃখের আগুনের মধ্য দিয়া চলে এসেছ, আজ এই সুখের দিনে সেই দৃশ্য আর দেখতে চাই নে। না সুরেশ, আমি নিজেই আজ রান্না কর্‌ব। তুমি কোন্ জিনিষ খেতে ভালবাস, বল ত!

সুরেশ। মা, দুঃখের ভিতর দিয়ে আমার দিন কেটে গিয়েছে, আমি যা পাই, তা খাই, সব জিনিসই আমার ভাল লাগে।

মা। সরযূ, তোমার কি খেতে ভাল লাগে?

নির্ম্মলা। মানুষের গালাগালি ছাড়া ভাল জিনিষ ত বেশি খায় নি, তাই সরযূ কোন জিনিষেরই নাম কর্‌তে পারবে না। ওকে তুমি যা রান্না করে দেবে তাই ওর ভাল লাগ্‌বে।

সুরেশের মা ছেলেমেয়েদের লইয়া যে বাসায় ছিলেন সেই বাসার মেয়েরাই তাহাদের রান্নার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু সুরেশের মার নিজের হাতে রান্না করিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়াইতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তিনি স্বহস্তে ডাল, আলু-পটলের ডাল্না, মাছের ঝোল, কিসমিসের চাট্নি ও মিষ্টান্ন রান্না করিলেন। সুরেশ খাইতে বসিয়া কহিল, "মা, তুমি প্রত্যেক জিনিষটির ভিতর তোমার ভালবাসা দিয়া রান্না করেছ, তাই আজ মনে হচ্ছে এমন চমৎকার রান্না আর কখনো খাই নি।"

মায়ের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আজ যদি সুহাসিনীও এই সঙ্গে থাক্‌ত, তবে এই সুখের মিলন আরো কতই সুখের হত।"

নির্ম্মলা। মা, দিদি কি সত্যই মারা গিয়াছেন? একদিন তোমার মতন তাঁকেও কি দেখ্‌তে পাব না?

সুরেশ। সেই যে তোমাকে একটা আশ্চর্য্য কথা বল্‌ব বলেছিলুম, এইবার তা বলি। বল্‌বার আগে জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের সরলা দিদিই যদি সুহাসিনী অর্থাৎ তোমাদের আপনার দিদি হন তা হলে কি খুব খুসী হও?

সরযূ। তিনি যদি আপনার দিদি হন, আর আমাদের সঙ্গেই থাকেন, তা হলে খুব মজা হয়। মা আপনি ত সরলা দিদিকে দেখেন নাই, তিনি যে কি ভাল, তা আর আমি বল্‌তে পারি নে।

নির্ম্মলা। দাদা, তবে কি সরলা দিদিই আমাদের আপনার বোন? তাঁর নামই কি সুহাসিনী ছিল? তাই হো'ক, তাই হো'ক। মেয়েরা ত দেখে বল্‌ত, সরলা দিদির চেহারা অনেকটা আমাদেরই মতন। দাদা, কি আশ্চর্য্য কথা বল্‌বেন, শীঘ্র বলুন, আমার যে শুন্‌তে বড়ই ইচ্ছা।

মা। সরলাই সুহাসিনী। সে তোমাদের আপনার দিদি।

নির্ম্মলা। মা, আপনি ত তাঁকে দেখেন নি, কি করে বল্‌ছেন, তিনিই আমার দিদি?

সুরেশ। সুহাসিনীর নাম এখন সরলা। আমাদের নৌকাডুবি হবার পরে জেলেরা তাকে নদীর তীরে পেয়েছিল। নগেনবাবু জেলেদের কাছ থেকে নিয়ে তাকে মানুষ করেছিলেন। সরলা আগে সে সব কথা জান্‌তনা। অল্পদিন হয় সবই জান্‌তে পেরেছে।

নির্ম্মলা। শুনে আমার কি সুখই হচ্ছে! এখনি যদি তাঁকে একবার দেখ্‌তে পেতুম! সরযূ, লক্ষ্মী বোন, শুন্‌লে ত আমরা সরলা দিদিরই ছোট বোন।

সরযূ। দাদা, আমরা সরলা দিদির কাছে কবে যাব?

মা। সুরেশ, কি বল্‌ব? মনের আনন্দে আজ যেন আমিও ছেলেমানুষের মতন হয়েছি। মনে হচ্ছে, পাখী হতে পার্‌লে এখনি উড়ে সুহাসিনীর কাছে যেতুম।

বর্ষাকালে জলে যেমন পুকুর ও খাল বিল ভরিয়া যায়, তেমনি সুখে সুরেশের মাতার ও সন্তানদের মন ভরিয়া গিয়াছে। তাই তাঁহারা অনেক সময় বসিয়া শুধু আপনাদের সুখ-দুঃখের কাহিনীই বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সুরেশের মাতা মনোরমা দেবী কহিলেন, "দেখ সুরেশ, তোমার বাবা যখন সোনার খনির সন্ধানে যাত্রা করেন, তখন এই সহরে বড়ই চোরের ভয় ছিল। তাই তিনি আমার এবং সুহাসিনীর অনেক টাকা দামের গহনা, মূল্যবান বস্ত্র এবং টাকাকড়ির হিসাব,—তা ছাড়া তোমার দাদামহাশয়ের সময়ের অনেক সোনার মোহর লোহার সিন্ধুকে ভরে মাটির ভিতর পুঁতে রেখেছিলেন। মাটি খুঁড়্‌লে হয় ত সিন্ধুক পাওয়া যাবে।"

সুরেশ। এখনি মাটি খুঁড়ে দেখা যাক না কেন।

সেই বাড়ীতে যিনি ছিলেন, তাঁর অনুমতি লইয়া সুরেশ নিজের হাতেই

মাটি খুঁড়িল। কয়েক হাত মাটির নীচে সিন্ধুকটি পাওয়ায় তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তখনি তালা ভাঙ্গিয়া সিন্ধুকটি খোলা হইল। কি আশ্চর্য্য! সোনার গহনা, রত্নহার, টাকা ও সোনার মোহর সবই ত রহিয়াছে, শুধু মূল্যবান কাপড়গুলিই খারাপ হইয়াছে। গহনা মোহরগুলি সিন্ধুকের ভিতর ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। দেখিয়া আর সকলের আনন্দ হইল, কিন্তু মনোরমা দেবীর, সুরেশের বাবার কথা মনে পড়ায় চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হিসাবের খাতাখানিতে দেখা গেল, সুরেশের পিতার ব্যাঙ্কে বিস্তর টাকা ছিল। তাহা ছাড়া তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়াছিলেন। নগদও প্রায় দশ হাজার টাকার সোনার মোহর আছে। সুরেশ মনে ভাবিল, পিতার জীবনবীমার ও ব্যাঙ্কের টাকা হাতে আসিলে আর নগেনবাবুর টাকা গ্রহণ করিবার আবশ্যকই হইবে না।

সুরেশের পিতা নামজাদা বিলাত ফেরত ডাক্তার ছিলেন। সহরের বিস্তর লোক তাঁহার কাছে নানারকমে উপকার পাইয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল, ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায়, সুরেশদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। আজ যখন সহরের লোক শুনিল, তাহাদের পরম উপকারী ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাগণ এখনো জীবিত, তাহারা এই সহরে আসিয়া তাহাদের আগের বাসাতেই বাস করিতেছে, তখন দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক সুরেশের মাতা এবং তাহার ছেলেমেয়েদের দেখিতে আসিলেন। সুরেশ করুণ ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় আপনাদের জীবনের সমস্ত কাহিনীই বর্ণনা করিল। শুনিয়া সকলেরই বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তখন সহরের অনেক সাহেব মেমও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জনের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দেখিতে আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আমরা অনেক দিন সরলার কথা কিছুই বলি নাই, আজ তাহার কথাই বলিব। সরলা, তাহার বাবা ও মা—অর্থাৎ নগেনবাবু ও কমলা দেবীর সঙ্গে কলিকাতায় ছিল। তাঁহারা এই দুই মাস কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। নগেনবাবুর কাছে হঠাৎ টেলিগ্রাম আসিল, বক্সারে তাঁহার ভাইয়ের স্ত্রী কাত্যায়নী দেবীর কঠিন পীড়া, বাঁচিবার আর আশা নাই। সেই জন্য নগেনবাবু ও কমলাদেবী সরলাকে বামুন ঠাকুরাণীর কাছে রাখিয়া বক্সারে চলিয়া গেলেন।

সরলা বাপ মা ছাড়া হইয়া বোর্ডিংয়ে রহিয়াছে বটে, কিন্তু কলিকাতা সহরের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরে আর কখনই থাকে নাই। বামুন ঠাকুরাণী তাহাকে মায়ের মতনই ভালবাসেন এবং আদর-যত্ন করেন, কিন্তু তা হইলেও আজ বাবা মায়ের জন্য তাহার প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। সরলাদের পাশের এক বড় লোকের বাড়ীতে বিবাহ ছিল, সেখানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কত লোকের আসা-যাওয়া, কত গান, কত বাজনা, কত বাজি পোড়ান, কত কোলাহল;—এই সকলের জন্য সরলার ভাল ঘুম হইল না। তাহার মনে কত চিন্তাই জাগিল, সে ভাবিতে লাগিল।

"আমার জীবনের কাহিনী ঠিক যেন একটা গল্পের মতন। শুনতে পাই আমার প্রকৃত পিতা মাতা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নাকি মানুষের পরম শ্রদ্ধার পাত্র ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আজ কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁরা বাপ-মা না হয়েও কন্যার মতন আমাকে মানুষ করলেন, তাঁরা আমাকে সকল সুখেই সুখী করেছেন। দুঃখ কাকে বলে আমি ত তা জানতেই পারি নি। হায়, তার পরে কোথা হতে

আমার আপনার ভাইবোন এসে আমার মনের উপরে মায়া বিস্তার কর্‌ল? আজ যে তাদের জন্য আমি কোন সুখেই সুখী হতে পারি নে! আজ কোথায় সেই অনাথিনী চিরদুঃখিনী বালিকা দুটি? কোথায়ই বা আমার ভাই?"

সরলা একটু নীরব থাকিয়া আবার আপন মনে বলিতে লাগিল—"দাদা কি আর বেঁচে আছেন? সোনার খনির সন্ধান কর্‌তে গিয়ে হয়ত বনের জানোয়ারের মুখে পড়েছেন, নয় ত রাক্ষসের মতন অসভ্য জাতির লোকেরাই তাঁকে হত্যা করেছে। নইলে এমনও ত হতে পারে যে, তিনি যথার্থই সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন, তার পরে গরুর গাড়ী বোঝাই করে যখন সোনা নিয়ে আস্‌ছিলেন, তখন পাহাড়ী দস্যুরা তাঁকে কেটে কুটে সব সোনা লুটপাট করে নিয়েছে!"

সরলা বিস্তর গল্পের বই পড়িয়াছে। তাই সে মনে মনে তার দাদার বিষয়ে অনেক রকম কল্পনা করিয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। অনেক রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকাল বেলায় বিয়ে বাড়ীর সানাইএর বাজনায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে আপনার ঘরে বসিয়া শুধুই দাদার আর দুটি বোনের কথা ভাবিতে লাগিল। এই সময় বামুন ঠাকুরাণী ছুটিয়া আসিয়া সরলার কাছে কহিলেন, "সরলা, ঐ দেখ ত চেয়ে কে তোমার কাছে আস্‌ছে?"

সরলার বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা রহিল না! সে চাহিয়া দেখিল, তাহারই দাদা সুরেশ। সরলা সুরেশকে প্রণাম করিয়া কহিল, "দাদা, তুমি যে বেঁচে আছ, আমি ত তা মনে কর্‌তেই পারি নি। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কোন খবর না দিয়ে, এখন কোথা হতে এখানে এলে?"

বামুন ঠাকুরাণী কহিলেন, "এই কয়মাস ধরে সরলা তোমার কোন খবর না পেয়ে নির্জ্জনে বসে শুধু চোখের জল ফেলেছে। তা আমি ছাড়া আর ত কেউ দেখতে পায় নি।"

সুরেশ কহিল, "সরলা, তুমি যে আমাকে বড়ই ভালবাস, আমার কোন খবর না পেলে তোমার ত কষ্ট হবেই। কিন্তু কোন খবর পাঠাইনি বলে আমি কি তোমাকে খুব ভালবাসি নে? লক্ষ্মী বোন আমার, তুমি যে আমারই ছেলেবেলার সেই পরম আদরের সুহাসিনী, তা মনে করলেও মন আনন্দে নৃত্য করে ওঠে। তবে দুঃখ পেয়ে পেয়ে আমার মনের একটা দিক যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছে, তাই তোমাকে আমার কোন খবর পাঠাই নি।"

সরলা। দাদা, তুমি আমাকে ভালবাস না ত কে আমাকে ভালবাসে?

সুরেশ। সরলা, ঐ চেয়ে দেখ না, তোমার অতি স্নেহের নির্ম্মলা ও সরযূকে যে নিয়ে এসেছি।

নির্ম্মলা ও সরযূ আসিয়া সরলাকে প্রণাম করিল। সরলা স্নেহের আবেগে দুটি বোনের হাত ধরিয়া কাছে বসাইয়া কহিল,—"এস এস, তোমরা প্রাণের কাছে এস। তোমাদের দেখে আমার মন যে সুখে ভেসে যাচ্ছে। এতদিন ত জানতুম না, তোমরা আমারই আপনার বোন। তোমরা কি দাদার কাছে শুনেছ, আমি তোমাদেরই আপনার দিদি?"

নির্ম্মলা। শুনেছি বই কি? দাদার কাছে যেদিন শুনলুম, আপনি আমাদেরই দিদি; সেদিন থেকে শুধুই ভাবছি, কবে আপনার কাছে এসে আপনাকে দেখতে পাব?

সরযূ। দিদি, আর ত আমরা কোথাও যাব না, এখন থেকে আপনার কাছেই থাকব।

সরলা। তা থাকবে বই কি! তুমি যে আমাদের সকলের চেয়ে ছোট। তোমার মতন আমাদের আদরের পাত্রী আর কে আছে?

নির্ম্মলা। দিদি, আপনি ত জানেন না, সরযূ আবার ব্রহ্মপুত্র নদীতে

পড়ে ডুবে যাচ্ছিল। ভাগ্যে দাদা তা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিই নদীতে লাফিয়ে পড়ে সরযূকে উপরে তুলে এনেছেন।

সরলা। মাগো! তাই নাকি? ব্রহ্মপুত্র নদীটার নামেই যে আমার শরীর শিউরে ওঠে।

সরযূ। দিদি, আপনি ত এখনো মাকে দেখ্‌তে পান নি, তিনিও যে আমাদের সঙ্গেই এসেছেন।

মনোরমা দেবী ধীরে ধীরে সরলার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত ঘর যেন আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিল। সরলার মনে হইল, স্বর্গ হইতে যেন এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারী নামিয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর সরলার মাতাকে এমনই দেবী প্রতিমা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ভক্তিতে সরলার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সুরেশ কহিল—"সরলা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে আমি সোনার খনির সন্ধানে গিয়েছিলুম। সোনা পাই নি বটে, কিন্তু তুচ্ছ সোনার চেয়ে লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ যে আমাদের মা, তাঁর দেখা পেয়েছি। বল ত এমন করে ঈশ্বরের অপার করুণা কয় জন মানুষ পেয়ে থাকে? আজ এই দেবীর মতন মাতার কাছে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমার জীবন সার্থক।"

মায়ের মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না, তিনি যত সহজে নির্ম্মলা ও সরযূকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সরলাকে সেরকম করিতে পারিলেন না। শুধুই পাথরের মূর্ত্তির মতন দাঁড়াইয়া সরলার সরলতা মাখা সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সরলা মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। মনোরমা দেবী সরলাকে কহিলেন—

"সুরেশের কাছে তোমার দয়াধর্ম্মের অনেক কথা শুনেছি। যাঁরা তোমাকে পালন করেছেন, তাঁরা আশ্চর্য্যভাবে তোমাকে সকল রকম শিক্ষাই দিয়াছেন। আমি আজ আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বর তোমাকে আরো ভাল করুন, তিনিই তোমাকে সুখে রাখুন।"

সরলা মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া একখানা বড় চৌকিতে বসিল। মায়ের চোখ জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। সরযূ ধীরে ধীরে দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মা দিদিকে আদর করুন, ভালবাসা দিন।"

সরযূ সকলের ছোট কি না, তাই এই কয়েকদিনের মধ্যেই মায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইয়াছে। মা সরযূকে কোলের ভিতর টানিয়া লইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সরলা মনে মনে কহিল—"হায় দুঃখিনী বালিকা, এতদিন লোকের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে আজ মায়ের স্নেহে এ কি তোমার আনন্দ? ঈশ্বর মাকে যে কি স্নেহময়ী করেছেন তা ভাব্‌লেও অবাক্ হয়ে যেতে হয়।"

সরযূ আবার কহিল, "মা আমি ত এই কয়দিনে আপনার কতই ভালবাসা পেয়েছি, আপনি দিদিকে আমারই মতন আদর করুন।"

মা এইবার সরলার খুব কাছে আসিয়া তাহার দুখানি হাত বুলাইতে লাগিলেন। সরলার প্রাণ যেন সুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে বামুন ঠাকুরাণী জলখাবার লইয়া সেই ঘরে আসিলেন। সরলা কহিল, "বামুনঠাকরুণ, আপনি শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবেন, আমার সাম্‌নে আমারই মা। ঈশ্বর দয়া করে এতকাল পরে মায়ের সঙ্গে আমার মিলন করে দিলেন। এম্নি করে যদি বাবার সঙ্গেও দেখা হত?"

বামুনঠাকুরাণী সরলার মাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আপনাকেই সরলার মা বলে মনে হয় বটে; যেমন সরলার সুন্দর চেহারা তেম্‌নি আপনার।"

সরলার মা। আমাকে সরলার মা না বল্লেও হয়। শুনেছি আপনি ঠিক মায়ের মতনই সরলাকে ভালবাসেন।

বামুনঠাকুরাণী। সে আপনার মেয়ের স্বভাবের গুণে। শুধু কি আমি, দার্জ্জিলিঙে আমাদের পাড়ার অনেক মেম সরলাকে মেয়ের মতন ভালবাসেন।

সরলার মা। সরলাকে যাঁরা প্রতিপালন করেছেন, আজ যদি তাঁদের দেখ্‌তে পেতুম, তা হলে তাঁদের চরণে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে পড়্‌ত।

বামুনঠাকুরাণী জলখাবার লুচি ও সন্দেশ আনিয়া রাখিয়াছিলেন। সরলার মা কহিলেন, "তোমাদের আজ আমিই জলখাবার পরিবেশন কর্‌ব।"

সরলা। দাদার কাছে শুনলুম, কালরাত্রে আপনি কিছুই খান-নি, আপনি এখন খান না, বামুনঠাকুরুণ পরিবেশন কর্‌বেন।

মা। আমি স্নানের পর ঈশ্বরের নাম না করে ত কিছুই খাই নে।

এই কথা শুনিয়া সরলার মার উপরে অতিশয় ভক্তি হইল। মা সবাইকেই জলখাবার পরিবেশন করিলেন। সরলা ও সুরেশ সেই খাবার সামগ্রীর মধ্যে মাতার অনুপম স্নেহ অনুভব করিয়া বড়ই সুখী হইল।

সমস্ত দিনটি মায়ের সঙ্গে সন্তানদের নানা কথায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। সুরেশ এবং তাহার মা সরলার নিকট তাঁহাদের সকল কথা বলিতে লাগিলেন। সমস্ত বাড়ীর ভিতরে যেন এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিল। এই আনন্দের মধ্যে বাহিরে কাহার সুমিষ্ট গান শুনা গেল। তাহা শুনিয়া সুরেশ চমকিয়া উঠিল। এ যে তাহারই পরিচিত গলা। সুরেশ বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখিল,বক্সারের সেই ভিখারিণী। ভিখারিণীই মধুরকণ্ঠে গান গাহিতেছিল।

সুরেশ ভিখারিণীর কাছে গিয়া কহিল—"বা! এ যে তুমি! এই কলিকাতা সহরে আমাদের বাড়ীর কাছেই যে তোমায় দেখতে পাব, এ ত স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এস, তোমাকে আমাদের বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাই। তুমি দেখে অবাক্ হবে, আমার মা, আমার তিন বোন এই বাড়ীর ভিতরেই আছেন। এক বাবা ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই আমার মিলন হয়েছে।"

সুরেশ ভিখারিণীকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে গেল এবং মাতাকে কহিল, "মা, যে ভিখারিণীর কথা তোমায় বলেছিলুম, এই দেখ সেই মেয়েটি।"

মা। এস এস, তুমিও যে আমার মেয়ে। তুমিই ত আমার সন্তানকে আশ্রয় দিয়ে বিপদ হতে রক্ষা করেছ।

সরলা উঠিয়া ভিখারিণীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরে কহিল, "এ যে বেশ হল, তুমিও বোন হয়ে আমাদের কাছেই থাক্‌বে।"

তার পর সুরেশ একে একে বোনদের ভিখারিণীকে চিনাইয়া দিল এবং কহিল, "তুমি কেমন করে কলিকাতায় এলে? এখানে কোথায় আছ?"

ভিখারিণী। আমার বাবা ত আর বেঁচে নেই। তাঁর মরণের পরেই আমি কাশীতে গিয়ে এক মাতাজীর আশ্রয় নিয়েছিলুম। তিনি বাঙ্গালা দেশের এক জমিদারের বিধবা স্ত্রী। তাঁর কয়েক হাজার টাকা ছিল। তিনি সেই টাকা নিয়ে কাশীতে সন্ন্যাসিনীর মতনই দিন কাটাচ্ছিলেন। তার পরে তাঁর মনে হল, তিনি পিতৃমাতৃহীন ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম খুলবেন। তিনিই আমাকে নিয়ে কলিকাতায় এসে বালিগঞ্জে পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়েদের জন্য একটি আশ্রম খুলেছেন। পঁচিশটি ছেলেমেয়ে সেখানে আছে। তাঁর টাকায় ত সব খরচ চলে না। তাই আমি লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে গান করে আশ্রমের জন্য টাকা সংগ্রহ করি।

সরলা। সে ত বেশ ভাল কাজ। তা ভিখারিণী দিদি, তোমাকে আমাদের বোন হয়েই এখানে থাকতে হবে। এখান হতে তোমাদের আশ্রমের জন্য যে টাকা আমরা দিতে পারি তা দেব। আর বাকী টাকা তুমি লোকের বাড়ীতে গান করে করেই সংগ্রহ করো।

ভিখারিণী। না বোন, তা কি আর হয়? আমি যে আশ্রমের অনেক কাজই করে থাকি। আর তাদের উপরে আমার এমনই একটা

ভালবাসা জন্মেছে, একদিন সহ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের না দেখলে আমার চলে না।

ভিখারিণীকে সরলা নানারকম জলখাবার খাওয়াইল এবং আশ্রমের জন্য কুড়িটাকার একখানি নোট দিল। সুরেশের মা মনে ভাবিলেন, তাহার গয়নাগুলি তিনি আশ্রমের কাজেই দান করিবেন।

কয়েকদিন সকলেরই খুব আনন্দে কাটিয়া গেল। তাহার পরে নগেনবাবু ও কমলা দেবী কলিকাতা আসিলেন। তাঁহাদের সমাদরে সুরেশের মাতা চোখে আর জল রাখিতে পারিলেন না। কমলা দেবী তাঁহার দুটি ছোট মেয়েকেও আপনার কন্যার মত মনে করিতে লাগিলেন।

কয়েক মাস পরে সুরেশের মা একদিন ভিখারিণীদের আশ্রম দেখিতে গেলেন। আশ্রমের মাতাজীকে তাঁহার দেবী বলিয়া মনে হইল। তিনিও আশ্রমে থাকিয়া পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়েদের সেবা করিবেন বলিয়াই সংকল্প গ্রহণ করিলেন। কেহই তাঁহাকে সে সংকল্প হইতে টলাইতে পারিল না। যে দিন আশ্রমে যাইবেন, সে দিন নগেনবাবুর স্ত্রী কমলা দেবীকে কহিলেন,–

"আপনি কি শুধু সরলারই মাতা ত নয়। আপনি সুরেশ, নির্ম্মলা, সরযূ—সকলেরই মা। আর উপরেই এই সন্তানদের সমস্ত ভার। আমি প্রতি সপ্তাহে ওখানে এসে একদিন থেকে ছেলেমেয়েদের ভালবাসা দিয়ে যাব।"

সুরেশের মা যেদিন আশ্রমে যান, সে দিন সব ছেলেমেয়েদের একত্র করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদের টাকাকড়ির কোনই অভাব নেই, তোমরা ভাল করে লেখাপড়া শিখবে, আর সকল বিষয়ে ভাল হতে চেষ্টা করবে। তোমাদের বাবাকে যে আর কখনো দেখতে পাবে, তার কোনই আশা নেই। আমি তাঁর একটি কথা তোমাদের বলছি, তোমরা সেই কথাটি সকল সময়েই মনে রেখ ; তিনি বলতেন—

"লেখাপড়া শেখাতেই মানুষের শক্তি, নির্ম্মল সৌন্দর্য্য, ঈশ্বরকে ভালবাসাতেই মানুষের ... দেশের এবং দশের উপকার করাতেই মানুষের মহত্ত্ব।"

সুরেশের মাতা আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। মধ্যে যে দিন তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে আসিতেন আসিবেন বলিয়া সকলেই পথের পানে চাহিয়া থাকিত। মা আসিয়া যখন অতিশয় ভালবাসিয়া ছেলেমেয়েদের নাম ... তখন ছেলেমেয়েদের মনে হইত, এ জগতে মায়ের ... আর কিছুই নাই।

সমাপ্ত